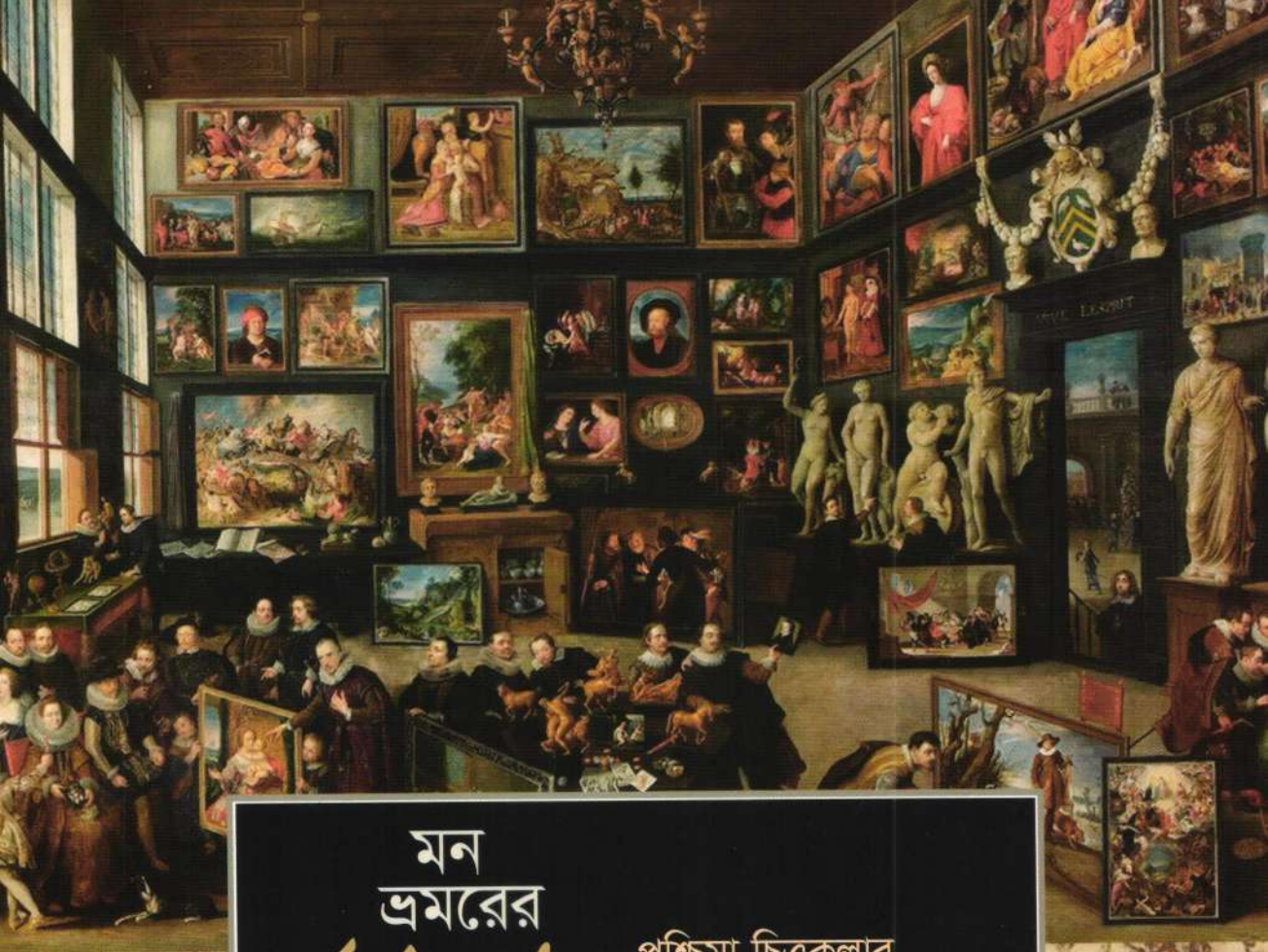

মন ভ্রমরের কাজল পাখায়

পশ্চিমা চিত্রকলার সমঝদারির হাতে খড়ি

পিনাকী ভট্টাচার্য

যারা শিল্পকলার ছাত্র নন, প্রথাগত শিল্পবোদ্ধা নন, তাঁদের জন্য পেইন্টিং নিয়ে এই বই। পেইন্টিঙের প্রধান প্রধান ধারা, চিত্রকলার নানা আন্দোলন, কাল, পর্ব নিয়ে সরল ভাষায় মনোহর ভঙ্গিতে আলাপ করা হয়েছে বইটিতে। কখনো এসেছে সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, সামাজিক দ্বন্দ্ব। সবকিছুর মধ্যে পেইন্টিংকে বসিয়ে শিল্পরস ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। এই ব্যাখ্যা চূড়ান্ত নয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তা হতেও পারেনা। কিন্তু একটা ব্যাখ্যাতো বটেই। পৃথিবীর ইতিহাসে যেই পেইন্টিংগুলো কালকে অতিক্রম করেছে, ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে, তার অধিকাংশই এখানে আলাপ করা হয়েছে। বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতোই।

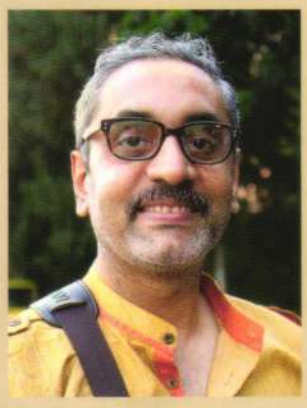

পিনাকী ভট্টাচার্য

তাঁর পরিচয় মূলত ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফেইসবুকে আলোচিত ও সমালোচিত। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রাজপথ থেকে যে কজন নতুন প্রজন্মের লেখক ও চিন্তক উঠে এসেছেন পিনাকী ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখার বিষয় বিচিত্র দর্শন, রাজনীতি, ফিকশন। প্রথম বই দর্শনের এক ক্লাসিক দেকার্ত-এর *ডিসকোর্স অন মেথড*। চিকিৎসক হিসাবে গ্রাজুয়েট এবং এখন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত। এই বইসহ মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৪।

মন ভ্রমরের কাজল পাখায়:
পশ্চিমা চিত্রকলার
সমঝদারির হাতে খড়ি

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

মন ভ্রমরের কাজল পাখায়

পশ্চিমা চিত্রকলার
সমঝদারির হাতে খড়ি

পিনাকী ভট্টাচার্য

https://nagorikpathagar.org

মন ভ্রমরের কাজল পাখায়
পিনাকী ভট্টাচার্য

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স : সাইলেনটেক্সট

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রকাশক : বাতিঘর, প্রেসক্লাব ভবন, জামালখান রোড, চট্টগ্রাম
ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামোটর, ঢাকা

মূল্য: ৪০০ টাকা

Mon Bhramarer Kajal Pakhay
by Pinaki Bhattacharya
Published by Baatighar, Press Club Bhaban, Jamal Khan Road, Chittagong, Bangladesh
Email: baatighar.pub@gmail.com, Web: www.baatighar.com

Phone: 031 2869391, 01733 067005

Price: Taka 400 only

ISBN : 978-984-8825-99-0

https://nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমি তখন অ্যাভেন্টিসে কাজ করি। কয়েকদিন থেকে প্যারিসে আছি একটা কাজে। বসও আছেন সাথে। অফিসের কাজের ফাঁকে এক রবিবারে আমার বস ইফতেখারুল ইসলাম আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন প্যারিসের মুস্যে দরসে তে। সাফল্যের সঙ্গে উনার ফ্রেঞ্চ ইম্প্রেশনইজমের উপর আগ্রহ ইনফিউজ করে দিলেন আমার মধ্যে। কয়েকটা পেইন্টিং দেখিয়ে দেখিয়ে এক্সপ্লেইন করেছিলেন। ব্যাস সেই যে শুরু পেইন্টিং নিয়ে আমার আগ্রহ। সেদিন তিনি আমাকে মিউজিয়ামে না নিয়ে গেলে, হয়তো কখনোই পেইন্টিং নিয়ে আগ্রহ জন্মাতোনা।

পেশাগত জীবনে আমি খুব অল্প সময় তাঁর সঙ্গ পেয়েছিলাম, তবে অল্প যেই সময় পেয়েছিলাম তা আমার স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল।

এই বইটা ইফতেখারুল ইসলামের হাতে তুলে দেয়ার উপলক্ষ পাওয়াটা আমার জন্য সৌভাগ্যের।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

ভূমিকা

ছবি দেখাও শিখতে হয়, সে শিল্পী হোক বা না হোক। আমি অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষকে দেখেছি পৃথিবী বিখ্যাত পেইন্টিং যার সামনে দাড়ালে দম বন্ধ হয়ে যাবার কথা সেই ছবির সামনে দিয়ে অবলীলায় মুহূর্তের দৃষ্টিপাত করে চলে যেতে। এটাও ঠিক, পৃথিবীতে পেইন্টিং এর সংখ্যা কম নয়। তাহলে একজন পেইন্টিং সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নেবে কোথায় থেকে? চিত্রকলার ইতিহাস জানবে কোথায় থেকে? ইংরেজিতে কিছু বই আছে কিন্তু বাংলা সেইরকম বই নেই। আমি শিল্পবোদ্ধা না হলেও এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। শিল্পবোদ্ধা না হই, আমি শিল্পের খাতক তো বটেই। আমি কীভাবে দেখি বুঝি সেটাই না হয় বললাম।

এই চিন্তা থেকেই বইটা লেখার কাজে হাত দেই। প্রতিনিধিত্বশীল সবগুলো চিত্রকলার ধারাকেই ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। বিখ্যাত পেইন্টিং এবং পেইন্টারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। পেইন্টিং ধরে ধরে তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে চিত্রকলার অগ্রসর পাঠকেরাও একটা অতিরিক্ত বিষয় পাবেন এই বইতে, সেটা হচ্ছে দর্শনের আলোকে চিত্রকলার পাঠ। যেখানে যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে দর্শনের আলাপ এসেছে।

বইটি পড়ে যদি পাঠক পেইন্টিং দেখতে সামান্য আগ্রহী হয় তাহলেই লেখক নিজেকে সার্থক বলে মনে করবে।

পিনাকী ভট্টাচার্য
ফেব্রুয়ারী ২০১৮, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা:

বইটি লেখার সময় নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন চারুকলার শিক্ষক এ এইচ চঞ্চল। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ছবি দেখা নিয়ে কিছু কথা ১১
মিউজিয়ামে ছবি দেখা ১১
রেনেসাঁ পেইন্টিং ১২
ব্যারোক ধারা ১৩
ন্যুড বা নগ্ন ছবি কেন আঁকা হয়? ১৪
ব্যারোক পেইন্টিং ১৫
মিকেলেঞ্জেলো ১৯
রেনেসাঁ পেইন্টিং: বত্তিচেল্লি ২১
এবার লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ২৪
স্বল্প খ্যাত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পেইন্টার ২৯
আবারো ব্যারোক ৩৩
লেইট ব্যারোক শিল্পী করেজ্জো ৩৪
রোকোকো পেইন্টিং ৩৬
দাভিদ ৩৭
ফ্রান্সের দরিদ্র পেইন্টার ৩৯
বিশ্বসেরা মোনালিসা ৪১
এল গ্রেকো, সেজান আর পিকাসোর প্রেরণা ৪৫
দাভিদ যেভাবে এনলাইটেনমেন্টের বিপদ দেখেছিলেন ৪৮
দেলাক্রোয়ার রোমান্টিসিজম ৫০
ভেনিসের চিত্রকরেরা আর তিন্তোরেত্তো ৫১
ভেনিশিয়ান রেনেসাঁ পেইন্টার জর্জনে ৫৪
ডাচ ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং; এনলাইটেনমেন্টকে উৎসাহ নিয়ে স্বাগত ৫৫
জর্মন রেনেসাঁ পেইন্টার ডিউরর ৫৬
ইংলিশ ল্যান্ডস্কেপ ৬০
মডার্নিজমের ক্রিটিকে টার্নার ৬১
গরীবের শিল্পী দ্যমিয়ে ৬২

https://nagorikpathagar.org

ইম্প্রেশনিজম ৬৭
ইম্প্রেশনিজম: ক্লদ মনে ৭০
ইম্প্রেশনিজম এদগার দেগা ৭১
ইমপ্রেশনিস্ট রেনোয়া ৭৪
পোস্ট ইম্প্রেশনিজম সেজান ৭৭
আবার ইম্প্রেশনিজম: লাঞ্চন অন দ্য গ্রাস, এদুয়ার মানে ৭৯
সেজানের বেদার্স ৮২
ভ্যান গগ: পোস্ট ইম্প্রেশনিজম ৮৩
পল গগ্যা ৮৫
ফোবিজম, আরি মাতিস ৮৭
জর্জ ব্রাক কিউবিজম ৮৯
পিকাসোর কিউবিজম ৯২
দাদাইজম: দ্যুশ্যাম্প ৯৪
এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম: উইলিয়াম ডি কুনিং ৯৯
এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম: জ্যাকসন পোলক ১০০
কনটেম্পোরারি পেইন্টিং ১০৩
কনটেম্পোরারি আর্ট এবং আইডেন্টিটি ১০৫
মডার্ন আর্টের আইডিয়া হিসেবে কোন স্থান বা স্পেইসের ব্যবহার ১০৮
দৈনন্দিন অবজেক্ট থেকে শিল্পকর্ম ১০৯
মডার্ন আর্টের ক্রিটিক ১১০

তথ্যসুত্র ১০
চিত্র পরিচিতি ১০৫
কালক্রম ১১৫
নির্ঘণ্ট ১১৯

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ১: রুবেন্সের আঁকা কর্নেলিস ভ্যান ডার গিস্টের কালেকশন

https://nagorikpathagar.org

ছবি দেখা নিয়ে কিছু কথা

ছবি দেখার চোখ তৈরি হয় অনেক ছবি দেখতে দেখতে। ছবিতে দেখতে হয় দুইটি গুণ। কী কী? যে কোন শিল্পের দুইটা গুণ থাকে। একটা মানবিক গুণ, আরেকটা প্লাস্টিক গুণ। বাস্তব জগতে যে ঘটনা দেখে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয় শিল্পবস্তু সেই ভাবের কাছাকাছি ভাবের উদয় হলে সেটা মানবিক গুণের কারণে হয়েছে। ধরা যাক দুঃখের জন্য কান্না এইটা মানবিক গুণ।

প্লাস্টিক মানে এমন কিছু যা বাঁকানো যায় নানা রূপ দেয়া যায়, বাঁকা চোরা করা যায়। বাস্তব জগতে যা কিছু জাগতিক আকার আমরা দেখি তার সব কিছুই প্লাস্টিক। কান্নাকে কীভাবে কী রঙে, রেখায়, কন্টুরে, আলোতে, স্পেসে, জমিতে দেখাবেন; কোথায় বেশী জোর দেবেন কোথায় কম জোর দেবেন সেটাই শিল্পীর বাহাদুরি।

ছবিতে প্রধান প্লাস্টিক উপকরণ রঙ। রঙের নানান্তরের ঔজ্জ্বল্য চোখকে আনন্দ দেয়। এরপরের প্লাস্টিক অঙ্গ হচ্ছে ড্রয়িং। রঙ আর রেখা কম্পোজড হয়ে তৈরি হয় ডিজাইন। ডিজাইন তখনই সৃষ্টি হয় যখন রঙ, রেখা, কম্পোজিশন নিজেদের ভিন্ন অস্তিত্ব হারিয়ে এক অখণ্ড শিল্পের প্রকাশ হয়। এরমধ্যে কোন একটা কম বা বেশী হলে ডিজাইন নষ্ট হয়। উপন্যাসে যেমন প্লট, সঙ্গীতের যেমন রাগ, ছবিতে তেমন ডিজাইন; যাকে অবলম্বন করে বাকী সবকিছু দাঁড়ায়। পেইন্টিং দেখার সময় এই দুই উপাদান বিচার করতে হয়।

মিউজিয়ামে ছবি দেখা

মিউজিয়ামে ছবি দেখতে যাওয়ার আগে একটা প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হয়। সব বিখ্যাত মিউজিয়ামের ওয়েব সাইট আছে। কী কী ফিচারড ছবি আছে সেটা তো সেখানে দেখতে পাবেনই, কিন্তু ছবি দেখতে যাওয়ার আগে যেটা আপনাকে জেনে নিতেই হবে, সেটা হচ্ছে মিউজিয়ামের কিউরেটর কীভাবে ছবি সাজিয়েছেন। সাধারণত চিত্রকলার ধারা অনুসারে একেক ঘরে একেকটা ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবি দেখতে গেলে সময় নিয়ে যাবেন। সকালে মিউজিয়াম খোলার সময়েই ঢুকবেন, খাওয়া দাওয়া সেখানেই করবেন। একদম

https://nagorikpathagar.org

মিউজিয়াম বন্ধ করার সময় বেরিয়ে আসবেন।

সাথে যদি কাউকে নিতে চান তাহলে এমন কাউকে নিন যার আপনার এবং চিত্রকলার উপর যুগপৎ আগ্রহ আছে। যে কোন একটা বিষয়ে অনাগ্রহ থাকলে তাঁকে আপনি নির্দ্বিধায় বাদ দিতে পারেন; সে আপনার স্বামী হোক বা স্ত্রী হোক। আপনার অনেক দিনের স্বপ্নের দিনটা নষ্ট করে দেবে সে, আর তার দিনটাও নষ্ট হবে।

এক নম্বর ছবিটা কর্নেলিস ভ্যান ডার গিস্টের নিজস্ব কালেকশনের ছবি। সাউদার্ণ নেদারল্যান্ডের আর্চ ডিউক এবং আর্চ ডাচেস আলার্ট আর ইসাবেলা দেখতে গেছেন কর্নেলিসের ছবির কালেকশন। ছবির বামদিকের নিচে ম্যাদোনার ছবির দিকে আঙুল তুলে আছেন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তিনিই কর্নেলিস। এই কর্নেলিস অনেক পেইন্টারের প্যাট্রন ছিলেন। রুবেন্স তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলেছিলেন, মাই নেভার ফেইলিং প্যাট্রন। এগুলোই ছিল আজকের পেইন্টিং এর মিউজিয়ামের আদি রূপ। আমার আলোচনা শুরু হবে রেনেসাঁ পেইন্টিং দিয়ে।

ছবি নম্বর ২: ব্যাপ্টাইজ অফ ক্রাইস্ট-ভেরোচ্চিও

রেনেসাঁ পেইন্টিং

ইউরোপের রেনেসাঁর কথা আমরা জানি। জগতের সমস্ত সৃষ্টিতে ঈশ্বরের মহিমা বদলে মানুষ নিজেই সব সৃষ্টি করেছে এই ধারণা ইউরোপ গ্রহণ করে। মানুষকে সে সব কিছুর কেন্দ্রে বসায়।

রেনেসাঁর ফলে শিল্পে সূচিত হয় বিপ্লব। ধর্ম বা স্বর্গীয় প্রভাব থেকে শিল্প মুক্ত হবার চেষ্টা করে। পেইন্টিং এ স্বর্গীয় চরিত্রেও মানুষের অভিব্যক্তি দেখা যেতে শুরু করে। এর আগে ডিভাইন চরিত্রগুলো সহজেই চেনা যেত। এখন আর চেনা যাচ্ছেনা। দেখে মনে হয় আমাদের আশেপাশের মানুষ। রেনেসাঁ পেইন্টিং এ মূলত দুইটি ধারা, আর্লি রেনেসাঁ আর হাই রেনেসাঁ।

https://nagorikpathagar.org

আর্লি রেনেসাঁয় যখন ডিভাইন চরিত্রগুলো মানুষের রূপ নিতে শুরু করলো তখন সে অবধারিত ভাবে স্পিরিচুয়ালিটি হারালো। এই রেনেসাঁ ধারাতে থেকেও চরিত্রগুলো মানুষের মতো রেখেও কীভাবে স্পিরিচুয়ালিটি ফেরত আনা যায় সেটাই হাই রেনেসাঁর কাজ। হাই রেনেসাঁর দুই বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর মিকেলাঞ্জেলো। আর্লি রেনেসাঁর শিল্পী বত্তিচেল্লি। বত্তিচেল্লি নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলাপ করবো।

ইতালির রেনেসাঁ শিল্পী ভেরোচ্চিওর দুই নম্বর ছবিটায় আর্লি আর হাই রেনেসাঁর দুই ধারার প্রভাব আছে। ভেরোচ্চিও ছিলেন আর্লি রেনেসাঁর শিল্পী। ছবিটা যীশুর ব্যাপ্টাইজ করার ছবি। যীশুর পায়ের কাছে বসে আছেন দুই দেবদূত। ভেরোচ্চিওর ছাত্র ছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ভেরোচ্চিও নিজে একটি দেবদূত আঁকেন আরেকটা আঁকতে বলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে। ৩ নম্বর ছবিটা দেখুন, ওই অংশটুকুকে বড় করা হয়েছে। একদম বাঁয়ের ছবি লিওনার্দোর আঁকা আর ডানের ছবি ভেরোচ্চিওর আঁকা।

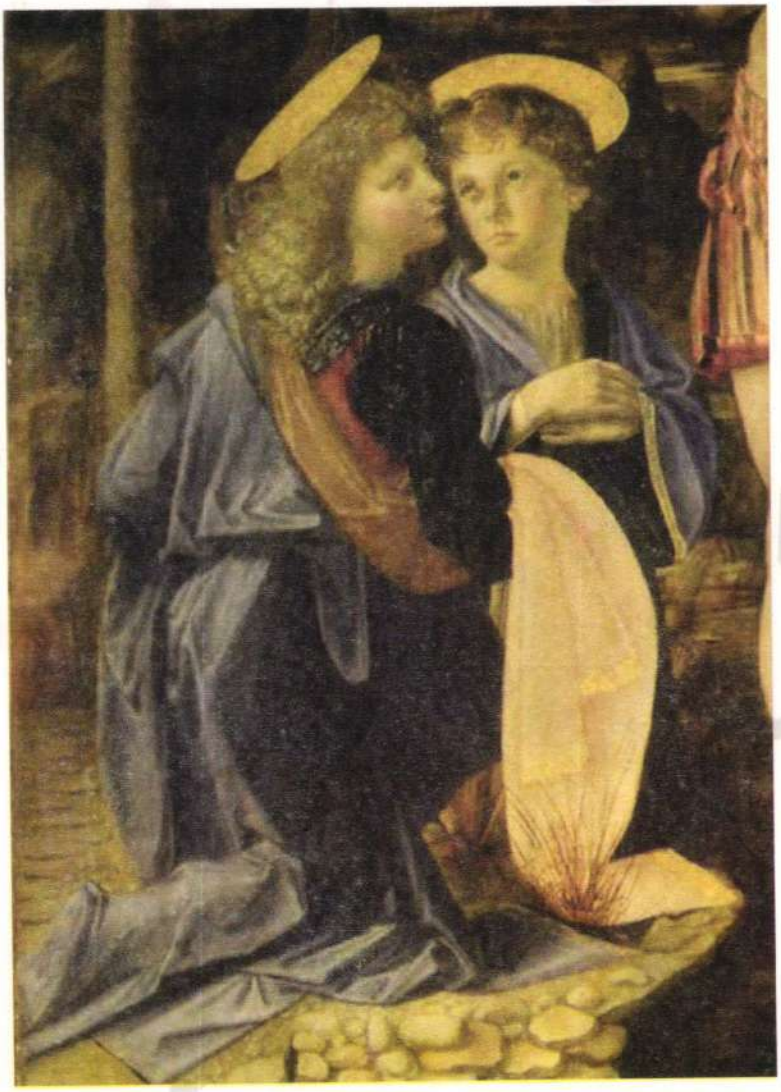

ছবি নম্বর ৩: ব্যাপ্টাইজ অফ ক্রাইস্ট-লিওনার্দো

একটা ছবি আর্লি রেনেসাঁর আরেকটা ছবি হাই রেনেসাঁর। ভেরোচ্চিওর আঁকা ছবিটা দেখুন। একদম স্পিরিচুয়ালিটি ছাড়া। মনে হয় পাশের বাড়ির বালক। এইটা আর্লি রেনেসাঁ। আর লিওনার্দোর আঁকা? আইডিয়ালি বিউটিফুল, শরীরে এক অপূর্ব বিভঙ্গ, গ্রেইসফুল ভঙ্গি, তাকানো আর শরীরে এক নরম দ্যুতি যেন স্বর্গীয়। এইটা হাই রেনেসাঁ।

ব্যারোক ধারা

এবার আলাপ করবো হাই রেনেসাঁর পরের ব্যারোক ধারা নিয়ে।

চিত্রকলার এই বিশেষ ধারা বুঝতে সাহায্য নিচ্ছি ভাস্কর্যের। কারণ চিত্রকলা

https://nagorikpathagar.org

আর ভাস্কর্যের ধারাগুলো একই সময়ে বিবর্তিত হয়েছে এবং চর্চা হয়েছে।

রেনেসাঁর শান্ত সমাহিত রূপের বিপরীতে ব্যারোক ধারা নিয়ে এলো গতি, এক্সট্রিম ইমোশন, ডিটেইল, আলো ছায়ার খেলা।

পাশাপাশি দুটো ভাস্কর্য দেখুন, ৪ ও ৫ নম্বর ছবির বিষয় একই পৌরাণিক ডেভিড আর গলিয়াথের যুদ্ধে ডেভিডের পাথর ছুঁড়ে মারার সময়টা ধরেছেন দুই ভাস্কর। বাঁয়েরটা মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিড যা রেনেসাঁ ভাস্কর্য আর ডানেরটা ব্যারোক ভাস্কর বের্নিনির।

মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিড যেন শান্ত সমাহিত, মানুষের এক্সট্রিম আইডিয়ালিস্ট ফর্ম, সে যে যুদ্ধে আছে সেটাই বুঝা যাচ্ছেনা। কিন্তু বের্নিনির ডেভিড যেন দৃশ্যপট ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে, শরীর বাঁকিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত। এমনকি দুই ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরা দেখুন।

রেনেসাঁ ধারায় থাকে শান্ত সমাহিত রূপ; ব্যারোকে থাকে ইমোশন্যাল ইনটেন্সিটি, শক্তি, এনার্জি। রেনেসাঁয় থাকে স্থিরতা, ব্যারোকে থাকে গতি। রেনেসাঁয় ফিগার থাকে আনুভূমিক অথবা উল্লম্ব, ব্যারোকে কৌণিক। রেনেসাঁয় আইডিয়াল ফিগার, ব্যারোকে রিয়েল ফিগার। রেনেসাঁয় সিমেট্রি, আর ব্যারোকে এসিমেট্রি। রেনেসাঁয় একই ধরণের আলো, ব্যারোকে আলো-ছায়ার খেলা। আপনি বের্নিনির ডেভিড দেখুন শরীরের মোচড়ে মোচড়ে আলোর খেলা ফুটে উঠছে।

ন্যুড বা নগ্ন ছবি কেন আঁকা হয়?

পেইন্টিং নিয়ে আলোচনায় কেউ কেউ প্রশ্ন করেন প্রাচীন ভাস্কর্য এমনকি পেইন্টিং এর চরিত্রগুলো নগ্ন থাকে কেন?

অ্যাসিরীয় সভ্যতায় নগ্নতাকে পরাজয়ের সমার্থক মনে করা হতো। অ্যাসিরীয় প্রাসাদের রেলিঙে দেখা যায় প্রতিপক্ষের পরাজিত যোদ্ধার মাথা কেটে নিচ্ছে জয়ী অ্যাসিরীয় যোদ্ধা। পরাজিত যোদ্ধার পরনে কোন কাপড় নাই। আমরা এখনো কাউকে পরাজিত করার বাসনায় বলি, ন্যাংটা করে ছেড়ে দেব। এটা অ্যাসিরীয় উত্তরাধিকার। আর্য সভ্যতাতেও নগ্নতা পরাজয়ের প্রতীক। মহাভারতে দ্রৌপদির বস্ত্র হরণের আগে পঞ্চ পাণ্ডবের পরনের প্রায় সব কাপড় খুলে নেয়া হয়েছিল।

গ্রিক সভ্যতায় এই নগ্নতার ধারণার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। গ্রিক সভ্যতা নগ্নতাকে বীরত্বের সাথে যুক্ত করে। এথেন্সে সকল যুবককে জিমন্যাসিয়ামে যেতে হতো। সেখানে নগ্ন হয়ে প্র্যাক্টিস করতে হতো। গ্রিক শব্দ 'জিমনো' থেকে এসেছে জিমন্যাসিয়াম শব্দটা; মানে নগ্ন। এথলেটরাও নগ্ন হয়ে পারফর্ম করতো। ঠিক এই ধারা থেকেই এসেছে যোদ্ধাদের নগ্ন হয়ে যুদ্ধ করার দৃশ্য। দাভিদ আলোচনার সময় সেটা খেয়াল করবেন।

এই নগ্নতার সাথে কামের বা যৌনতার কোন সম্পর্ক নাই এটা বুঝানোর জন্যই ভাস্কর্যগুলোর পুরুষাঙ্গ দেখানো হয় ক্ষুদ্র করে। প্রাচীন গ্রিসে নগ্ন অবস্থায় যৌন উত্তেজনা প্রদর্শন করাকে দুর্বলতা বলে বিবেচনা

https://nagorikpathagar.org

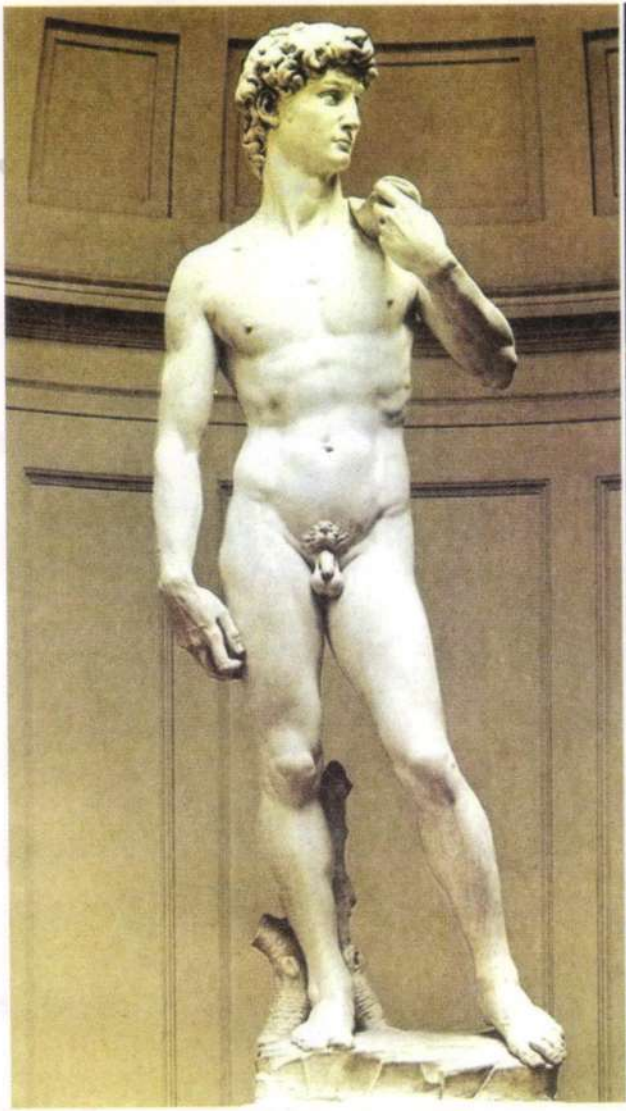

ছবি নম্বর ৪: ডেভিড-মিকেলেঞ্জেলো

ছবি নম্বর ৫: ডেভিড-বের্নিনি

করা হতো। ৬ নম্বর ছবি দেখুন।

ব্যারোক পেইন্টিং

ব্যারোক ভাস্কর্যের উপমা দিয়ে এই ধারার পরিচয় দিয়েছিলাম। এখন ব্যারোক ধারার একটা পেইন্টিং এর সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেই। এই ছবিটার নাম ক্রুশিফিকেশন অব সেইন্ট পিটার, এঁকেছেন ক্যাভাজ্জিও (৭ নম্বর ছবি)। সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট পল, ক্যাথলিক চার্চের দুই অবিস্মরণীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। পিটারকে ক্রুশিফাই করা হয়। পিটার বলেছিলেন যেভাবে যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৬: ডিস্কবোলাস মিরন

https://nagorikpathagar.org

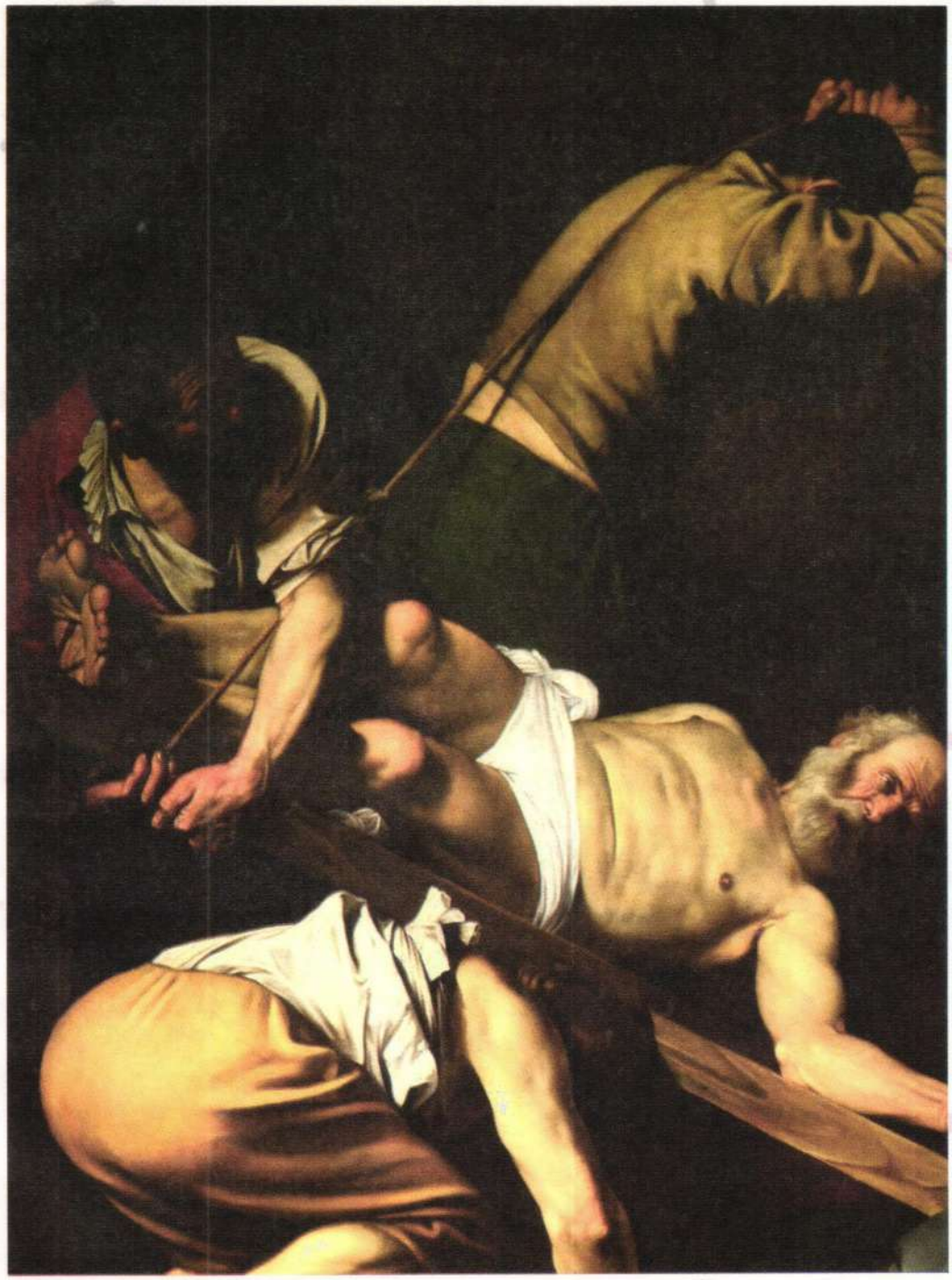

ছবি নম্বর ৭: ক্রুসিফিকেশন অব সেইন্ট পিটার - ক্যাভাজ্জিও

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৮: ক্রুসিফিকেশন অব সেইন্ট পিটার - ক্যাভাজ্জিও

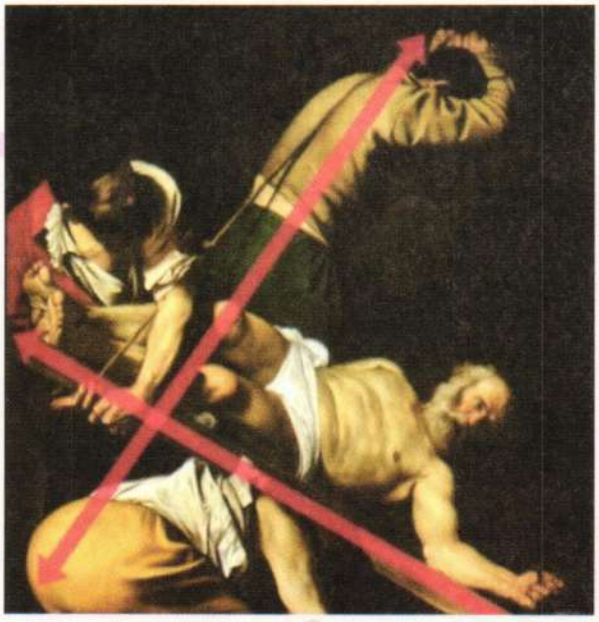

ছবি নম্বর ৯: ক্রুসিফিকেশন অব সেইন্ট পিটার - ক্যাভাজ্জিও

সেভাবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলে যীশুর অপমান হবে তাই তাঁকে যেন উল্টো করে ক্রুশে দেয়া হয়। ছবিতে পিটারকে ক্রুশে বিদ্ধ করার পরে ক্রুশকে উল্টো করা হচ্ছে যখন তখনকার সময়ে ছবিটা ধরা হয়েছে। ব্যারোক ধারার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছবিতে একটা দারুণ গতি আছে, সব কিছুই আছে একটা মোশনের মধ্যে। কৌণিক কম্পোজিশনটাও চিনে নিতে অসুবিধা হয়না। ক্রুশটাই কৌনিকভাবে ক্যানভাসে আছে, আরেক কৌনিক ফিগার হচ্ছে যে দড়ি দিয়ে ক্রুশকে টেনে উপরে উঠাচ্ছে। নয় নম্বর ছবি দেখুন। ব্যারোক ধারার ছবির ফিগার যেন আপনার স্পেইসে ঢুকে যায়। পেইন্টিং এর এই কৌশলকে বলে ফৌরশর্টেনিং। পিটারের পা দেখুন, যেন ক্যানভাস ফুঁড়ে আপনার স্পেইসে ঢুকে পড়েছে।

https://nagorikpathagar.org

আলো আর ছায়ার শার্প কন্ট্র্যাস্ট দিয়ে ফিগারে ভলিউম আনার চেষ্টা ব্যারোক ধারার আরেক বৈশিষ্ট্য। ক্রুশের নিচের দিকটা হাত দিয়ে যে টেনে উঠাচ্ছে তার মুখটা ভালো করে খেয়াল করুন ৮ নম্বর ছবিতে। আলো আর ছায়ার শার্প কন্ট্র্যাস্ট দিয়ে চেহারায় ভলিউম আনার কৌশলটা ভালো বুঝা যাবে।

রেনেসাঁ পেইন্টিং এ দেখবেন ফিগারের পিছনে ল্যান্ডস্কেপ। কিন্তু ব্যারোকে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড কালো, আর ফিগার গুলো অত্যধিক উজ্জ্বল। পুরো ফিগারগুলোকে বাহুল্য ছাড়াই ছবির মূল বিষয়কে দর্শকের মুখের উপরে এনে ফেলে। হাত আর পায়ের পেরেকের ডিটেইল দেখুন (৭ নম্বর ছবি), ইন্টেন্স ইমোশন তৈরির জন্য এমন স্পষ্ট আর ভিভিড আঁকা। রেনেসাঁর ছবিতে স্ট্যাবিলিটি আর ব্যালেন্স এখানে নেই বরং আছে গতি আর ইনস্ট্যাবিলিটি।

মিকেলেঞ্জেলো

রেনেসাঁ, বিশেষ করে হাই রেনেসাঁর আলাপ শেষ। কিন্তু খেয়াল করলাম মিকেলেঞ্জেলোই আলাপ করা হয়নি। এযাবৎ কালের সেরাদের সেরা পেইন্টার কাম ভাস্করকে এহেন উপেক্ষা অমার্জনীয়। তিনি বেঁচে থাকলে গালি দিয়ে আমার ভুত ছাড়িয়ে দিতেন। কেন গালি দিতেন সেটা লেখা শেষ হলে বুঝতে পারবেন। বাই দ্য ওয়ে, প্রথমেই জানিয়ে দেই তিনি কিন্তু কবিও ছিলেন। প্রেমের সনেট লিখতেন। ঈশ্বর মাঝে মাঝে কাউকে দু'হাত ভরে মেধা দেন। মিকেলেঞ্জেলো ছিলেন তেমন একজন অবিস্মরণীয় মেধার মানুষ।

মিকেলেঞ্জেলোর গুরু ছিলেন গিয়ারল্যান্ডার। মানে তাঁর গুরুর পারিবারিক পেশা ছিল গলার মালা বা গিয়ারল্যান্ড বানানো, তাই নাম গিয়ারল্যান্ডার। তিন বছর ছবি আঁকা শিখেছিলেন গিয়ারল্যান্ডারের কাছে। অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা জানি ছাত্র শিক্ষককে মাইনে দেয়, কিন্তু গিয়েরল্যান্ডার উল্টো মিকেলেঞ্জেলোকে মাইনে দিতেন মাসে মাসে। এরপর তিনি শিখতে গেলেন ভাস্কর্য বানানো।

মিকেলেঞ্জেলো ছিলেন বদরাগী আর ঠোঁট কাটা, যা মনে আসতো বাছবিচার না করে বলে দিতেন। একদিন এক তরুণ ভাস্কর্য গড়ছেন, মিকেলেঞ্জেলো বললেন, ধুর কী বানাইতেছেন, এইডা কিছু হইলো? আর যায় কোথায়? সেই তরুণ ভাস্কর ক্ষেপে গিয়ে মিকেলেঞ্জেলোর নাক ফাটিয়ে দিলেন। মিকেলেঞ্জেলো পাল্টা মার দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায়না, তবে তাঁকে ভাঙা নাক নিয়েই বাকী জীবনটা কাটাতে হয়েছিল। এরপরে মিকেলেঞ্জেলো গেলেন রোমে পোপের কাছে কাজ করতে। পোপের তো তাঁর কাজ দারুণ পছন্দ হল। পোপ ঠিক করেছিলেন ভ্যাটিক্যানের সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে ছবি আঁকা থাকবে। এই কাজ তিনি করতে বললেন মিকেলেঞ্জেলোকে। মিকেলেঞ্জেলো বললেন, আরে ধুর আমি গড়বো ভাস্কর্য, ছবি আঁকতে পারবো না, আর বেশ খাটুনির কাজ এটা। এই কথা শুনে তাঁর শত্রুরা রটিয়ে দিল, আরে ধুর ও পারে নাকি ছবি আঁকতে? পারেনা তাই অজুহাত দিচ্ছে। শুনে ক্ষেপে গেলেন মিকেলেঞ্জেলো। ক্ষেপে গিয়েই কাজটা নিলেন। ভাগ্যিস ক্ষেপেছিলেন তিনি। এমন শত্রুর দরকার আছে।

ছাদের নিচে ভারা বাঁধা হল। মিকেলেঞ্জেলো সেই ভারায় উল্টো হয়ে শুয়ে আঁকতে শুরু করলেন। ব্রাশে বেশী রঙ নেয়া যায়না, মুখের উপরে রঙ পড়তে থাকে। আঁকা হচ্ছে মুখ, পা কোথায় আঁকা হবে সেটা আগে হালকা করে একে আবার নিচে নেমে দেখেন ঠিক আছে কিনা। সে এক বিশাল হ্যাপা। এর মাঝে আবার

https://nagorikpathagar.org

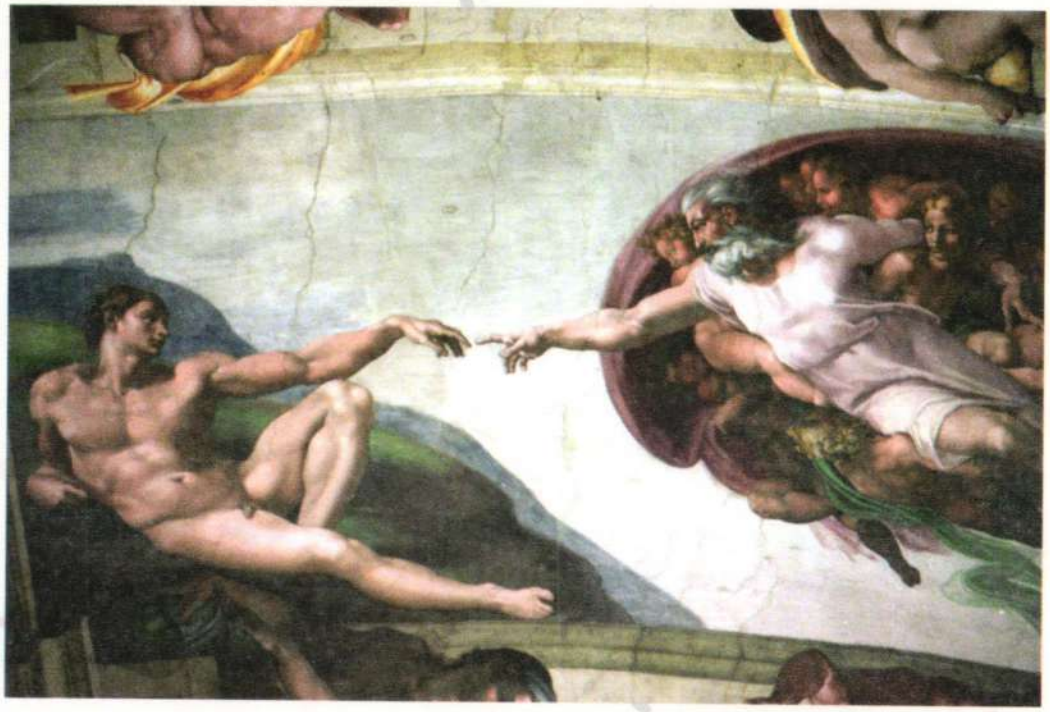

ছবি নম্বর ১০: সিস্টিন চ্যাপেল - মিকেলেঞ্জেলো

আছে পোপের খবরদারি। সেই সময় তাঁরা খুব খবরদারি করতো পেইন্টারদের উপরে। বলতো এইভাবে আঁকো, ওইভাবে আঁকো, ওই রঙ দাও, সেই রঙ দিওনা। এমন আজগুবি আবদার করে পেইন্টারদের জান কালা কালা করে দিত। ভাবটা এমন, টাকা দিচ্ছে চার্চ, তুমি চার্চের কথা শুনবানা, মানে??

যাই হোক একদিন পোপ এসে মিকেলেঞ্জেলোকে বাণী দিচ্ছেন, এইভাবে আঁক, ওইটা আঁকলা ক্যান, ওই রঙ দিলা ক্যান। মিকেলাঞ্জেলো কিছু না বলে ভারা থেকে পোপের মাথা ঘেষে বিশাল একটা হাতুড়ি ফেলে দিলেন। হাতের টিপ ভালো ছিল মিকেলেঞ্জেলোর; পোপের মাথা ভাঙ্গেনি, কিন্তু বেচারা এতো ভয় পেলেন যে মিকেলেঞ্জেলোকে আর ঘাঁটাতে সাহস পান নাই।

যাই হোক সাড়ে চার বছরে শেষ হল আঁকা। তবে কিছু জায়গায় মিকেলেঞ্জেলো সোনার জলে রঙ করতে চেয়েছিলেন, পোপ আর সেই সুযোগ দেননি। ছবি দেখার জন্য সিস্টিন চ্যাপেলের দ্বার খুলে দেয়ার পরে সারা রোম ফেটে পড়লো। ধন্যি ধন্যি পড়লো চারিদিকে।

পুরো ছাদ জুড়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে সব ছবি আঁকা। আদমের জন্ম থেকে নুহের প্লাবন। দশ নম্বর ছবিটি আদমের। সম্ভবত মানুষের সবচেয়ে সৌন্দর্য মণ্ডিত ছবি। কি বিপুল কাঁধ আর পেশী, আর সেই সাথে কমনীয়তা আমাদের আদি পিতার।

সেই সময়েই চলছে দিকে দিকে মানুষের জয়যাত্রা। এই ছবি আঁকা শেষ হওয়ার মাত্র ১৬ বছর আগেই

https://nagorikpathagar.org

কলম্বাস আমেরিকা খুঁজতে পাল তুলেছিলেন। আর ঠিক ১১ বছর পরেই শুরু হবে ইউরোপে প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন। সেই মানুষকেই কি এঁকেছিলো মিকেলেঞ্জেলো আদমের সুরতে?

আর হ্যাঁ ওই যে বলেছিলাম আমাকে গালি দিয়ে ভুত ছাড়াতেন। কারণ এমনিতেই তিনি ছিলেন বদরাগী, বয়স যতই বাড়তে থাকলো তিনি হয়ে উঠলেন আরো খিটখিটে। আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে কি রকম বিস্ফোরক মেজাজ হতো আল্লাহই মালুম।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর মেজাজ নাহয় আমরা আরো হাজার হাজার বছর সহ্য করলাম। কি বলেন?

ছবি নম্বর ১১: প্রাইমাভেরা - বত্তিচেল্লি

রেনেসাঁ পেইন্টিং: বত্তিচেল্লি

রেনেসাঁ পেইন্টিং এর আলাপ শেষ করবো অথচ বত্তিচেল্লি আসবে না? হতেই পারেনা। আগেই বলেছি বত্তিচেল্লি আর্লি রেনেসাঁর পেইন্টার। আর রেনেসাঁ মানে মনে আছে নিশ্চয়; প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান সংস্কৃতির

https://nagorikpathagar.org

পুনর্জন্ম। যাই হোক বত্তিচেল্লির একটা ছবি সবাই মনে হয় দেখেছেন; বার্থ অব ভেনাস। এটা অবশ্যই বত্তিচেল্লির সেরা ছবি তবে একমাত্র সেরা ছবি নয়, আরেকটা ছবি আছে যা কিছুটা কম পরিচিত। আজকের আলোচনা সেটা নিয়েই। ছবিটার নাম প্রাইমাভেরা বা বসন্তোপাখ্যান। এই ছবিটা বিশেষ এক কারণে

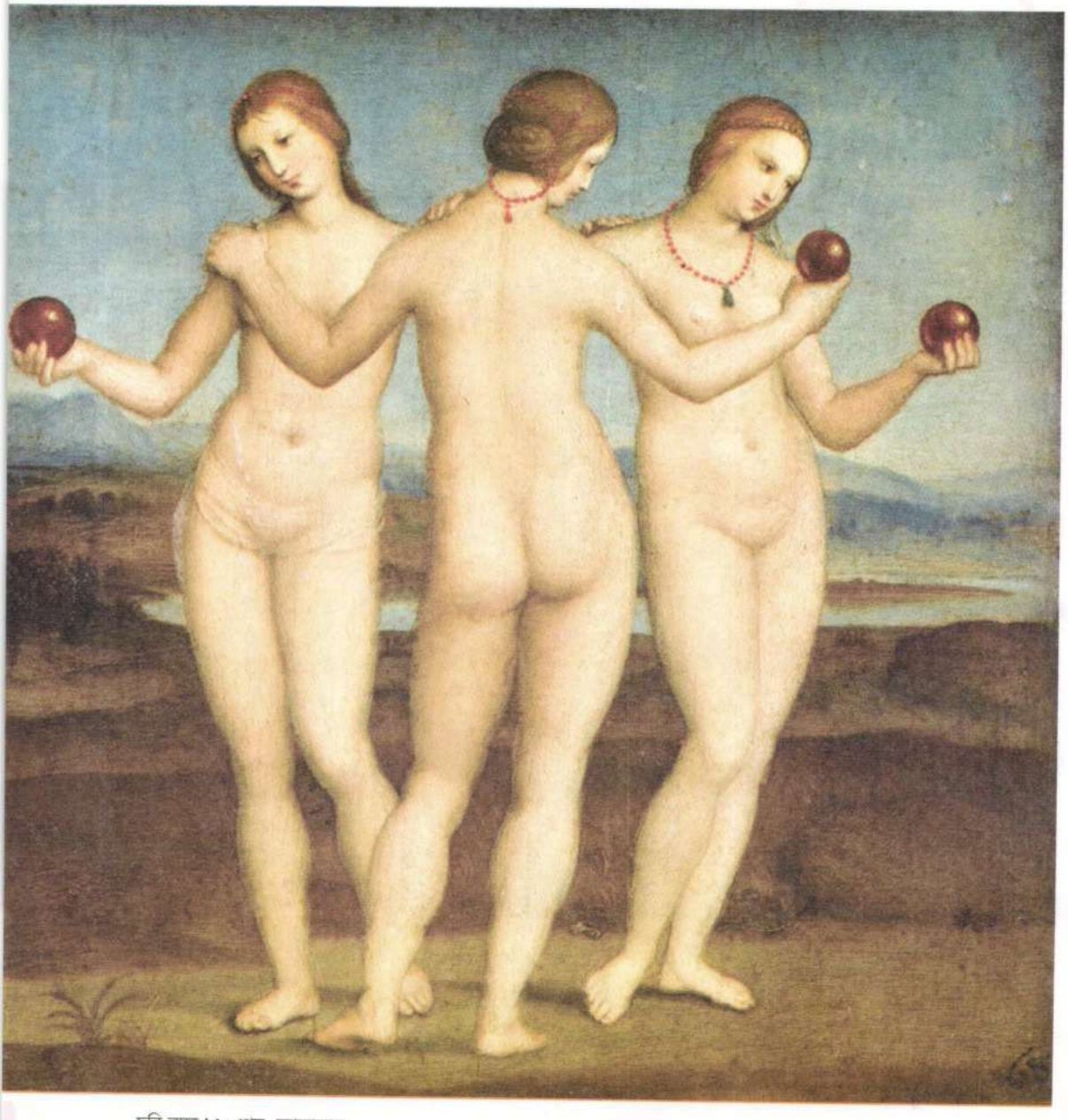

ছবি নম্বর ১২: গ্রেস র‍্যাফায়েল

https://nagorikpathagar.org

আমার খুব প্রিয়। কেন, সেটা লেখাটা পড়া শেষ হলেই জানতে পারবেন। আমার ধারণা এই ছবিটা আপনারও খুব প্রিয় হবে। ছবিটা আলাপের আগে একটু বত্তিচেল্লি সম্পর্কে জেনে নিই।

বত্তিচেল্লির আঁকায় একটা বিশেষ ধরণ ছিল। তার আঁকা ফিগারগুলো দেখলে মনে হয় তারা ভারহীন, মেয়েরা খুব তন্বী, আর মুখগুলো অস্বাভাবিক রকম কমনীয়, দেখলে যেন ঘোর লাগে। বিষ্ণু দের একটা কবিতা আছে, নাম শিখণ্ডীর গান

"তাকিয়ে দেখো-এই কি দোষ হায়?
শিল্প শুধু শিল্প শুধু দায়ী।
শিল্পভাবে-মুখ কি দুখে চায়
তাকিয়ে দেখো-এই কি দোষ হায়?
মুখের ছাঁচ বত্তিচেল্লি প্রায়।
প্রেমে পতন ছাড়া কি কিছু নাই।"

ছবি নম্বর ১৩: রোমান গ্রেস

লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রায়মাভেরার নারীদের শরীরে খুব পাতলা স্বচ্ছ কাপড়। শরীরের ভেতরে যেন সবকিছু দেখা যায়। এমন অদ্ভুত ধরণের কাপড় আপনি ইউরোপের চিত্রকলায় কখনো আর দেখবেন না। এখানেই আমার আগ্রহ। এই কাপড়টা কী জানেন? কোথাকার তৈরি জানেন? অবাক হবেন না, এগুলো ঢাকাই মসলিন। আমি এটা যখন আবিষ্কার করেছি উত্তেজনায় সেদিন আমার ঘুম আসেনি। একবার ভাবুন, আমরা ঢাকায় আসা বিদেশি বন্ধুদের বত্তিচেল্লির ছবি দেখিয়ে বলছি, এই কাপড়গুলো যেখানে তৈরি হতো তুমি সেই শহরে এসেছো। 'ইন ফ্যাক্ট এই কাপড় এখনো তৈরি হয়'। এই একটা বাক্যের মার্কেটিং পটেনশিয়াল কী হতে পারে ভেবে দেখেছেন? আরেকটা কথা এটা যে ঢাকাই মসলিন সেটা আমার আবিষ্কার নয়, এটা অশোক মিত্রের আবিষ্কার। তার লেখা *পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা* বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠায় এই কথা তিনি বলেছেন। তিনি অবশ্য দেখিয়েছেন যে সেই সময় ইতালিতে ঢাকা থেকে মসলিন যেত। গ্রিক মাইথোলজির ক্যারেক্টার পরছে ঢাকাই মসলিন ভাবা যায়?

https://nagorikpathagar.org

যাই হোক এবার ছবিতে আসি। এই ছবির মাঝের ফিগারটা ভেনাস। পিছনের গাছপালা দেবতা চরিত্রের মাথার পিছনে স্বর্গীয় দ্যুতির ইলিউশন তৈরি করেছে। ভেনাসের মাথার উপরে কিউপিড। কিউপিড কিন্তু ভেনাসের সন্তান। ডাইনে নীল ফিগারটা যেফিরের, যে বাতাসের দেবতা, ক্লোরিসকে হরণ করতে এসেছে। ক্লোরিস হচ্ছে ফুলের দেবতা। ক্লোরিস কথা বললে তার মুখ দিয়ে বসন্তের গোলাপ বেরিয়ে আসে। এইবার আসেন বাম দিকের তিনটা ফিগার। এগুলো হচ্ছে গ্রেস বা স্বর্গীয় চরিত্র। এই তিনজন দেবরাজ জিউসের কন্যা। তিনজন গ্রেস হচ্ছে ইউফোরসিন যে আনন্দের দেবী, এখান থেকেই ইউফোরিয়া কথাটা এসেছে। এরপরে এগলিয়া যে এলিগেন্সের দেবী আর থ্যলিয়া যে যৌবন আর সৌন্দর্যের দেবী। এই তিনজন গ্রেসের পরনে আছে ঢাকাই মসলিন। গ্রেস চরিত্রগুলো রেনেসাঁ এবং রেনেসাঁ পূর্ব রোমান ভাস্কর্যের জনপ্রিয় বিষয় ছিল। কারণ এই তিনজনের বিভিন্ন দিকের কম্পোজিশন নানা দিক থেকে, নানা এংগেলে ফিগারগুলো প্রেসেন্ট করার সুযোগ পেত শিল্পীরা। আপনাদের রেফারেন্সের জন্য র‍্যাফায়েলের আঁকা একটি গ্রেসের ছবি আর রোমান গ্রেসের একটি ভাস্কর্যের ছবি দিলাম (১২ ও ১৩ নম্বর ছবি)।

দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে বত্তিচেল্লির বেশ কিছু ছবি পুড়ে যায়। কিন্তু অবাক বিষয় হচ্ছে বত্তিচেল্লি নিজেই নিজের ছবি পুড়িয়ে দেন। কীভাবে? সেই সময় ফ্লোরেন্সে একজন খ্রিস্টান সাধু নাম সাভোনারোলা। সে খুব সুবক্তা ছিল। কথা বলে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারতেন, তিনি বেশ কিছুদিন থেকে ছবি আঁকা, গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ এসবকে ধর্ম বিরোধী কাজ বলে প্রচার করছিলেন। এই প্রচার যখন তুঙ্গে ওঠে তখন ফ্লোরেন্সবাসি একদিন সত্যি সত্যিই বাদ্যযন্ত্র, আমোদ প্রমোদের জিনিস, তাস-পাশা, মদ সব শহরের মাঝখানে এনে আগুন ধরিয়ে দিল, বত্তিচেল্লিও ভাবলেন আমি কিসে কম যাই, আমিও তো ছবি এঁকে বড় অধর্ম করেছি। তাই সে তার ছবিগুলো এনে ওই আগুনে ফেলতে লাগলো। কিছু ছবি একেবারে পুড়ে যায়। পরে তাঁকে তার বন্ধুরা নিরস্ত করে; নইলে সব ছবিই যেত একেবারে। যাই হোক মানুষের উন্মত্ততা একসময় থেমে যায়। আর সাভোনারোলা একের পর এক এইরকম উস্কানি দিতেই থাকলো। ফ্লোরেন্সবাসি বিরক্ত হয়ে রাম ধোলাই দিল; শুধু তাই নয় তাকে বাজারে ধরে নিয়ে এসে গলায় ফাঁস দিয়ে লটকে দিল। এরপর একদল লোক মৃতদেহ নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই পানিতে ফেলে দিল। কিন্তু এই ফ্যানাটিক যা ক্ষতি করার সেটা ততদিনে করে ফেলেছে, পৃথিবীর শিল্পরসিকরা হারিয়েছে বত্তিচেল্লির কিছু অমূল্য পেইন্টিং। সাভোনারোলার উস্কানিতে আরেকজন পেইন্টার ছবি পুড়িয়েছিলেন। তার কথা পরে বলছি।

এবার লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি আমরা জানি মোনালিসা। প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামে আমরা কেউ গেলে মোনালিসার সাথে একটা দাঁত কেলিয়ে ছবি তুলে আনি। এমন ফটো আমারো একটা আছে। তবে আজকে আমি মোনালিসা নিয়ে আলাপ করবো না। করবো লিওনার্দোর আর একটা ছবি দ্য লাস্ট সাপার নিয়ে।

এটা আঁকা হয়েছিল মিলানের এক গির্জার ভিতরে রেভারেন্ডদের খাবার ঘরের দেয়ালে। দেয়ালে সেই সময়ে ভেজা আস্তরে আঁকা হতো ছবি। রঙ ভেজা আস্তরের মধ্যে ঢুকে ফিক্স হতো। এই পদ্ধতিকে বলা হতো ফ্রেস্কো। ইটালিয়ান ভাষায় ফ্রেস্কো মানে ফ্রেশ। ভেজা আস্তরে আঁকলে বলা হতো ফ্রেস্কো বুয়োনো।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ১৪: দ্য লাস্ট সাপার (গির্জার ভিতরে দেখতে যেমন) - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

লিওনার্দো কিন্তু ভেজা আস্তরে আঁকেননি, এঁকেছিলেন শুকনো আস্তরে। সেইটার নাম ফ্রেস্কো মেস্কো। আস্তর তো ভেজা সবসময় থাকবেনা। শুকিয়ে যেতে থাকবে, তাই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঁকা শেষ করতেই হবে। এই সময়ের স্বল্পতার কথা ভেবেই হয়তো শুকনো আস্তরে লিওনার্দো ছবিটা আঁকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না। কারণ তখনো শুকনো আস্তরে ছবি আঁকলে সেটাকে কীভাবে স্থায়ী করা যায় সে বিষয়ে জানাবুঝা কম ছিল। যাই হোক লিওনার্দো আঁকলেন ছবিটা। কয়েক বছরের মধ্যেই নানা জায়গা থেকে রঙ উঠতে শুরু করলো। চার্চ তখন অন্য শিল্পী এনে তাকে দিয়ে ছবিটার যেখানে রঙ উঠে গেছে সেখানে রঙ লাগিয়ে নিল। কী ভয়ানক কথা ভাবুন, লিওনার্দোর ছবির উপরে তুলি চালাচ্ছে নাম না জানা বাজারের পেইন্টার। ছবির বারোটা বেজে গেল। এরপরে চার্চ সিদ্ধান্ত নিল এখানে একটা দরজা লাগাতে হবে। ব্যাস ছবির কিছু অংশ স্থায়ীভাবে নষ্ট হল। যিশুর পায়ের কাছে দরজার চিহ্ন দেখুন ১৪ ও ১৫ নম্বর ছবিতে।

এই সর্বনাশের পর প্রায় তিনশো বছর পরে মিলানে এলো নেপোলিয়ানের সেনা। তারা এই ঘরটাকে আস্তাবল বানালো। আমাদের অজন্তার গুহাগুলিকেও কিন্তু বৃটিশ আর্মি আস্তাবল বানিয়েছিল। শুধু তাইনা, নেপোলিয়ানের সেনারা যীশুকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই জুডাসকে লক্ষ্য করে জুতা থেকে শুরু করে

https://nagorikpathagar.org

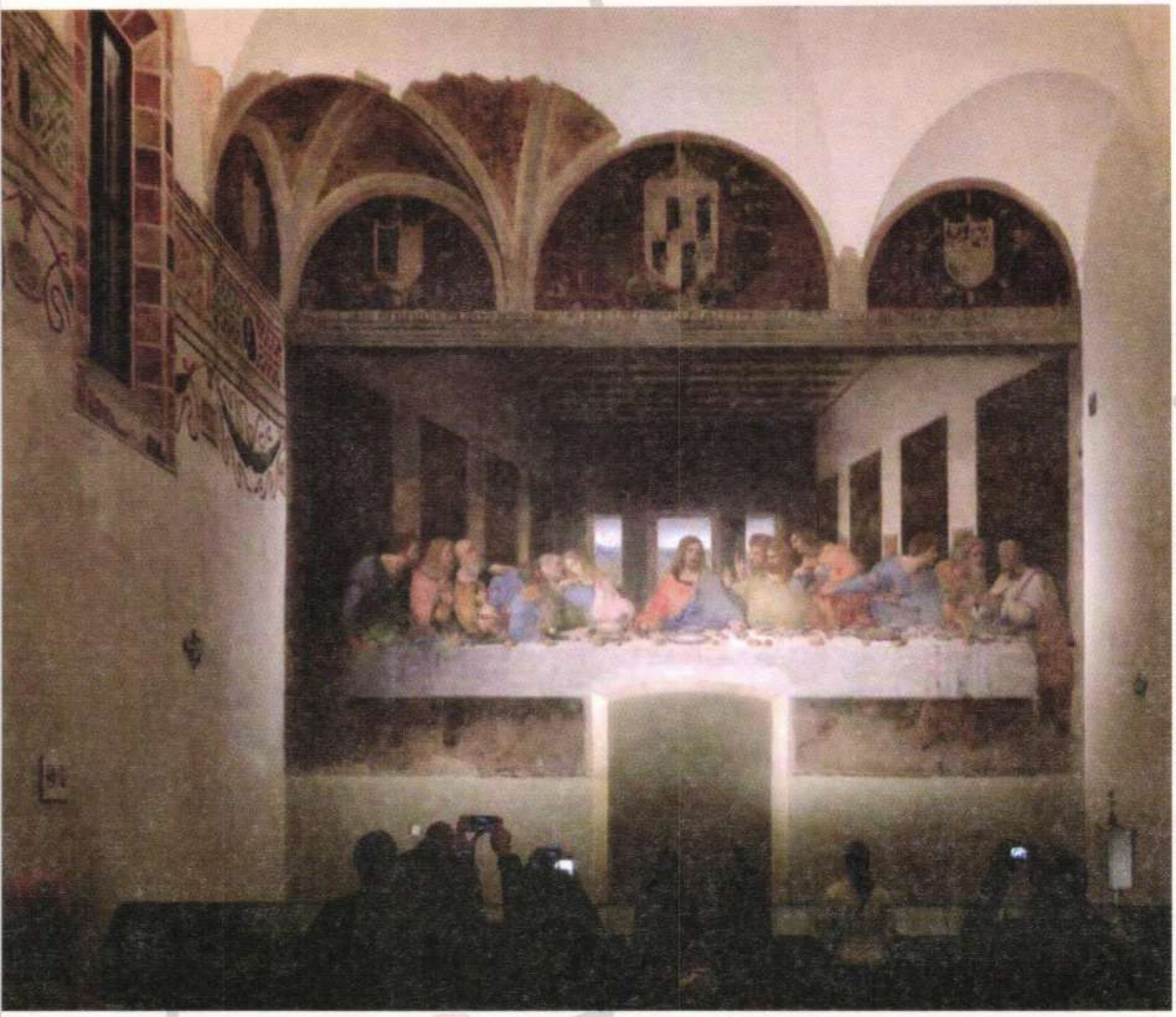

ছবি নম্বর ১৫: দ্য লাস্ট সাপার (গির্জার ভিতরে) - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

হাতের কাছে যা পেত তাই ছুড়ে মেরে হাতের টিপ প্র্যাক্টিস করতো, বলাই বাহুল্য গর্দভগুলোর হাতের টিপ অতো ভালো ছিলনা, তাই সব কিছু জুডাসের শরীরে না পরে আশেপাশেও পড়তো। ছবিটার স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেল।

১৪ নম্বর ছবিটা, রেস্টোরেশনের পরে ফ্রেস্কোর এখনকার অবস্থা। ১৫ নম্বর ছবিটা দর্শক হিসেবে যখন দেখতে যাবেন তখনকার অবস্থা কেমন হবে সেটা বুঝাবার জন্য। ১৬ নম্বর ছবিটা একটা কল্পনার ছবি, লিওনার্দো যখন ছবিটা এঁকেছিলেন তখন ঠিক কেমন ছিল তার ধারণা। আর ১৭ নম্বর ছবিটা লিওনার্দোর নোট বইয়ে এই ছবির খসড়া স্কেচ।

https://nagorikpathagar.org

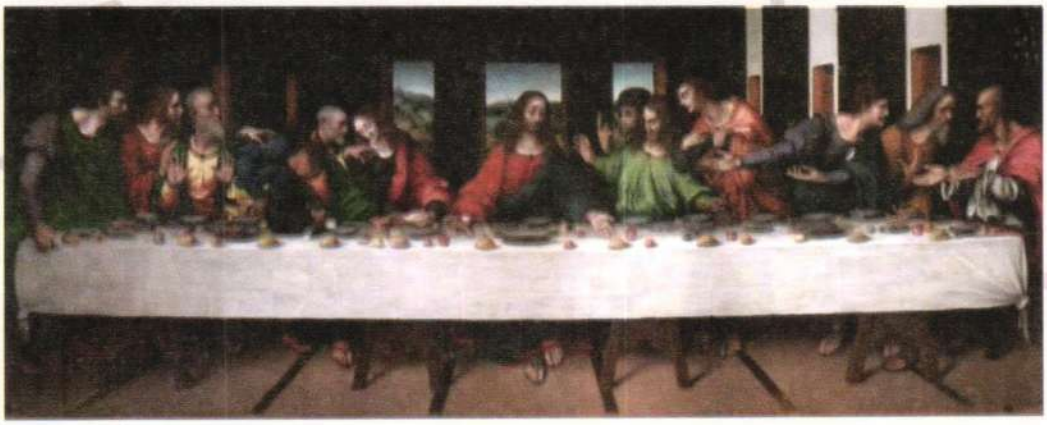

ছবি নম্বর ১৬: দ্য লাস্ট সাপার (কল্পিত) - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

এবার আসুন মূল ছবির গল্পে। ছবিটা যীশুর শেষ ডিনার, এখানেই যিশু বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে ধরিয়ে দেবে। এই কথাটা বলার ঠিক পরের মুহূর্তের ছবি এটা। যীশুর এই কথা শুনে যে বিচিত্র ইমোশনের এবং ইনটেন্স ড্রামার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই ছবিটা তারই প্রতিচ্ছবি।

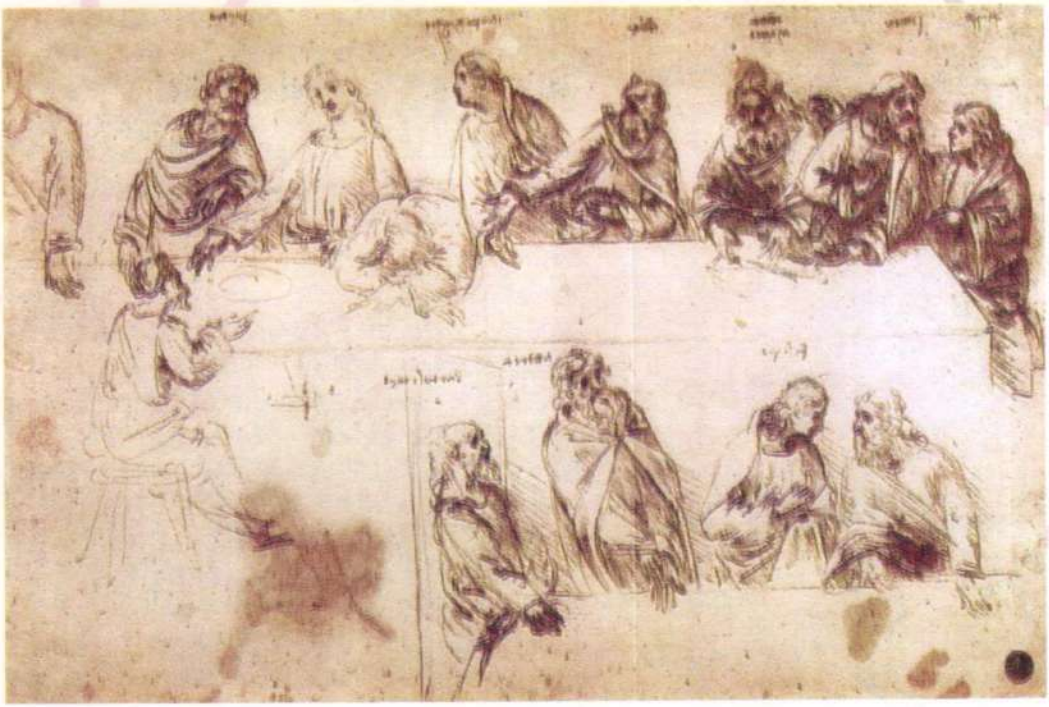

ছবি নম্বর ১৭: দ্য লাস্ট সাপার (লিওনার্দোর নোট বইয়ে এই ছবির খসড়া স্কেচ)

https://nagorikpathagar.org

এই কথার পরেই যীশু বলেন "এই নাও, খাও; এ আমার দেহ।" এর পরে তিনি পেয়ালা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও সেটা শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "পেয়ালার এই আঙুর-রস তোমরা সবাই খাও, কারণ এ আমার রক্ত যা অনেকের পাপের ক্ষমার জন্য দেওয়া হবে"। ছবিতে দেখুন যীশুর প্রসারিত এক হাত যাচ্ছে রুটির দিকে আরেক হাত যাচ্ছে আঙুর রসের দিকে। যীশুর ডান দিকে কালো চেহারার জুডাসকে দেখুন। সে বাম হাতে একটা পোটলা ধরে আছে যার মধ্যে যীশুকে ধরিয়ে দেবার ইনাম হিসেবে তিরিশ রৌপ্য মুদ্রা আছে। আরেক হাত দিয়ে যীশু যেদিকে হাত বাড়িয়েছেন সেদিকেই হাত বাড়িয়েছে।

জুডাসের পাশের দাড়িওয়ালা মাথা বের করে আছে পিটার, আরেক হাতে ছুরি, যে যীশুকে রক্ষা করতে চায়। যে বলছে 'কে সেই বিশ্বাসঘাতক আমাদের বলুন'। আর পিটারের পাশে আছে জন। বারোজন শিষ্যকে মোট চারটা গ্রুপে একেকটা গ্রুপে তিনজন করে ভাগ করেছেন। বিস্ময়, হতাশা, ক্ষোভ, বেদনা মিলে একেক গ্রুপে একেক অনুভূতি।

স্কেচে কিন্তু তিনি ভিন্ন কম্পোজিশনের কথা ভেবেছিলেন। মূল ছবিতে যীশুকে দেখুন, শান্ত সমাহিত। যীশুর শরীর একটা সর্বসম ত্রিভুজ। মাথাটা একটা বৃত্তের কেন্দ্রে। জানালা মাথার পিছনে স্বর্গীয় দ্যুতির আভা

ছবি নম্বর ১৮: সাভোনারোলা - বার্তেলেমো

ছবি নম্বর ১৯: সেবাস্টিয়ান - বার্তেলেমো

https://nagorikpathagar.org

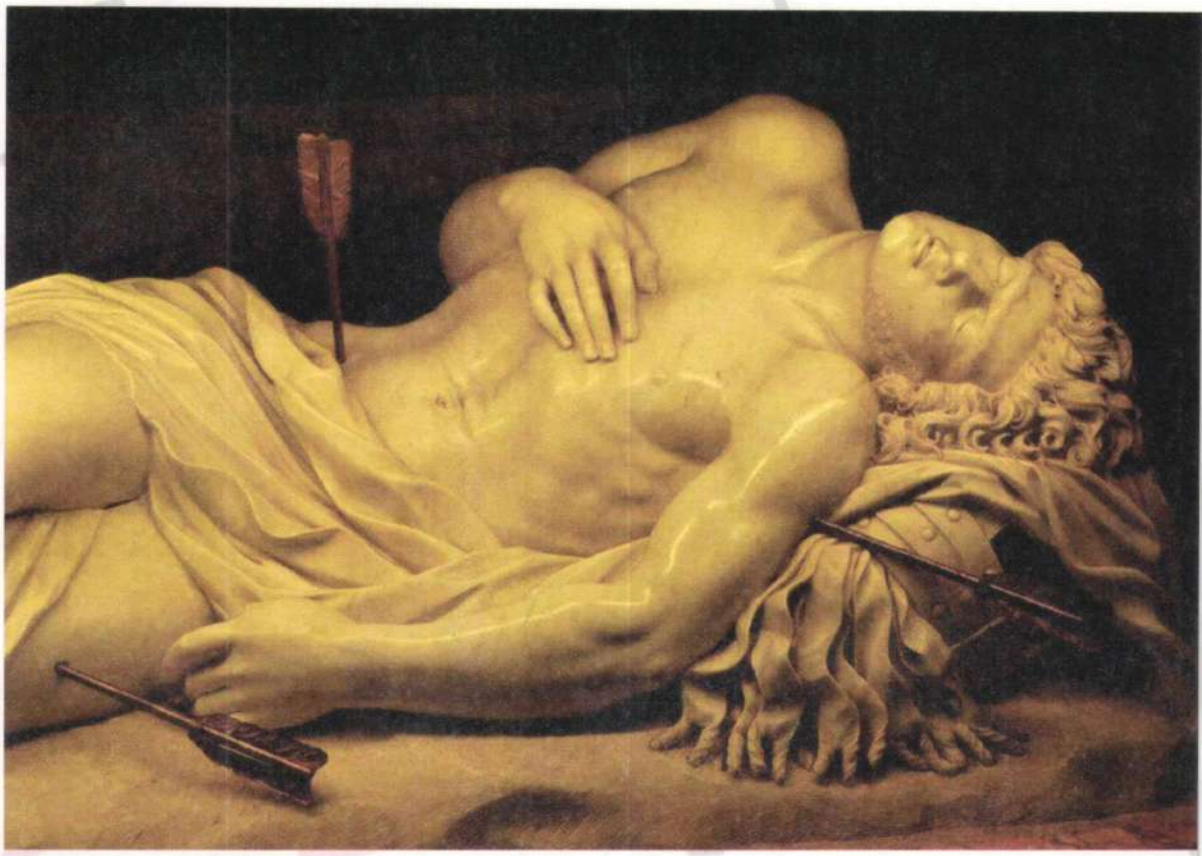

ছবি নম্বর ২০: তীরবিদ্ধ সেবাস্টিয়ান - বার্তেলেমো

তৈরি করেছে। চারিদিকের মানবিক চেহারাগুলোর মাঝে পারফেক্ট ডিভাইন ক্যারেক্টার।

স্বল্প খ্যাত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পেইন্টার

বত্তিচেল্লিকে নিয়ে আলাপের সময় বলেছিলাম, ফ্লোরেন্সে এক খ্রিস্টান ফ্যানাটিক সাধুর কথা। যার বক্তৃতার জোশে বত্তিচেল্লি তাঁর বেশ কয়টি পেইন্টিং আগুনে পুড়িয়েছিলেন। সেই সাধুর নাম মনে আছে নিশ্চয়, সাভোনারোলা। এই সাভোনারোলার উস্কানিতে আরেকজন ফ্লোরেন্সের পেইন্টার আগুনে ছবি পোড়ায় তাঁর নাম ফ্রা বার্তেলেমো। তবে ফ্রা বার্তেলেমো, সাভোনারোলার ভক্ত ছিল খুব। সাভোনারোলার পরিনতিতে খুব কষ্ট পান বার্তেলেমো। একটা ছবিও আঁকেন সাভোনারোলার। শোনা যায় সাভোনারোলা খুব কদাকার ছিলেন, ঈগলের মতো নাক ছিল। বার্তেলেমো তাঁর ছবিটা সুদর্শন করে আঁকেননি। ছবিতে ফুটে উঠেছে এক দৃঢ়চেতা, নির্মোহ মানুষের ছবি। সাভোনারোলা ঘৃণিত হলেও তাঁর ছবিটা একটা মহৎ শিল্প বলে বিবেচিত হয় (১৮ নম্বর ছবি)।

https://nagorikpathagar.org

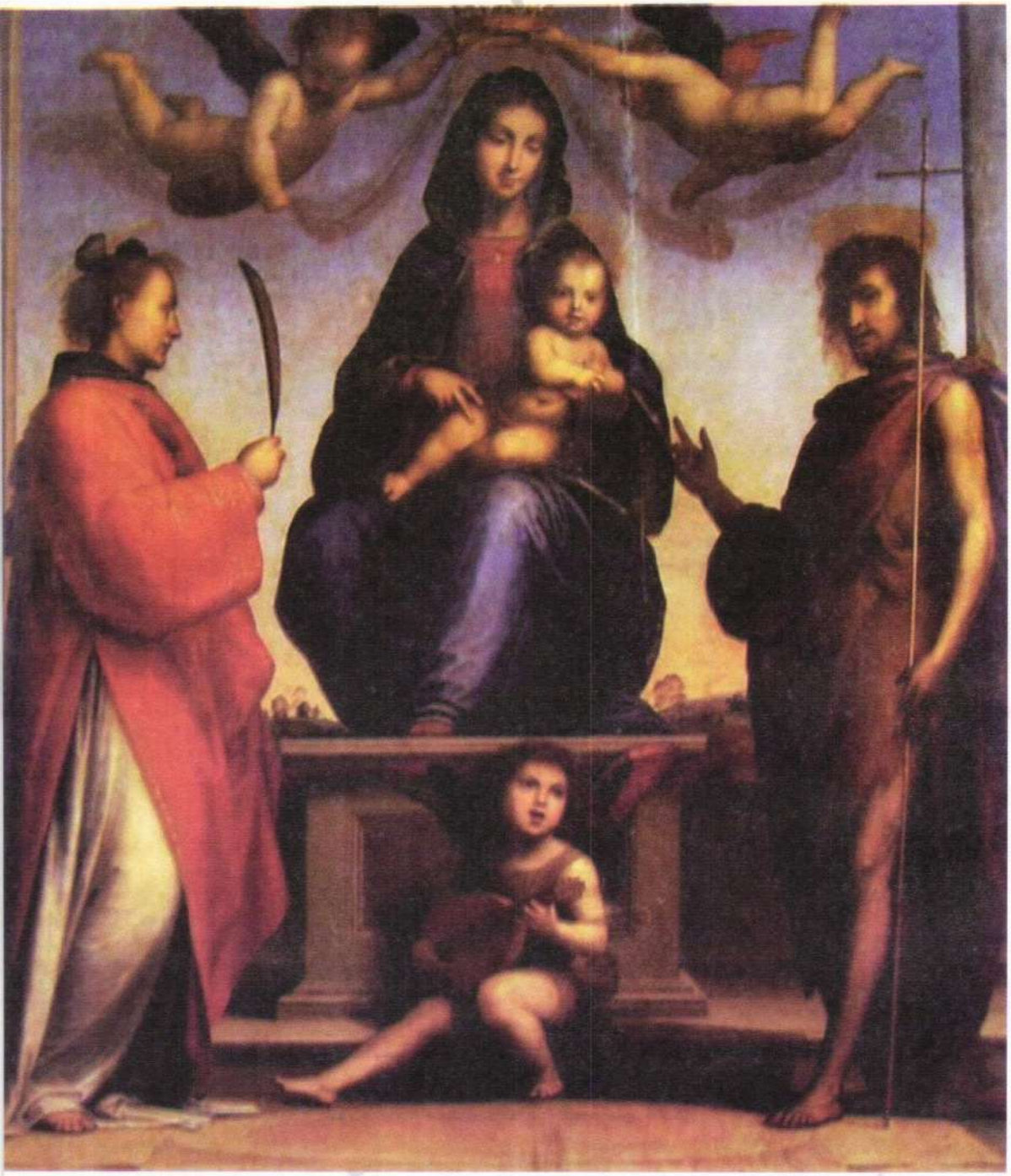

ছবি নম্বর ২১: ম্যাদোনা - বার্তেলেমো

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ২২: সিস্টিন ম্যাদোনা- র‍্যাফায়েল

https://nagorikpathagar.org

সাভোনারোলার মৃত্যুতে বার্তেলেমো এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে তিনি ছবি টবি আঁকা ছেড়ে খ্রিস্টান সাধু হবার জন্য মনাস্টারিতে ভর্তি হলেন। সাধু হয়ে যাবার পরেও তিনি অনেকদিন ছবি আঁকেননি। শুধু বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতেন। একদিন সবাই মিলে তাঁকে চেপে ধরলো, বলল, আরে মনাস্টারির জন্য ধর্মীয় ছবি আঁকো না হয়।

বার্তেলেমো ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বিষয় হিসেবে নিলেন সাধু সেবাস্টিয়ানকে। সেবাস্টিয়ান একজন খ্রিস্টান শহীদ, যাকে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের অপরাধে রোমানেরা গাছের সঙ্গে বেঁধে তীর ছুড়ে হত্যা করে। এই সেবাস্টিয়ানের তীর বিদ্ধ দেহ পেইন্টিং এবং ভাস্কর্যের জনপ্রিয় বিষয় ছিল। ২০ নম্বর ছবিটা দেখুন, এটা সেবাস্টিয়ানের তীরবিদ্ধ অবস্থার একটা ভাস্কর্য।

ছবি নম্বর ২৩: নাইট ওয়াচ - রেমব্র্যান্ট

https://nagorikpathagar.org

বার্তেলেমো ছবি আঁকলেন সেবাস্টিয়ানের। ১৯ নম্বর ছবি দেখুন। সবাই বলল, ছি ছি ন্যাংটা ছবি কেন? দাও ফেলে। ছবিটা সরিয়ে ফেলা হল মনাস্টারি থেকে।

বার্তেলেমোর আরেকটা মৌলিক অবদান ছিল পেইন্টিং এ, যেকারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ। রেনেসাঁ পর্যন্ত অসংখ্য ম্যাদোনার ছবি আঁকা হয়েছে। ম্যাদোনা মানে হচ্ছে মেরী মাতা তাঁর কোলে শিশু যীশু। ইটালিয়ান ভাষায় ম্যাদোনা মানে 'মাই লেডি'। এর আগে যত ম্যাদোনা আঁকা হয়েছে, সেখানে যীশুকে বুড়োটে লাগে আর দেবদূতদের আঁকা হতো ম্যাদোনার পাশে। বার্তেলেমো এই প্রথম আঁকলেন শিশু যীশু আর পায়ের কাছে বসা দেবদূত। ২১ নম্বর ছবি দেখুন। এই ভঙ্গিটা সবার খুব পছন্দ হল, এভাবেই ম্যাদোনা আঁকা শুরু করলেন পেইন্টারেরা। এই ভঙ্গিটা পছন্দ হল র‍্যাফায়েলেরও; আঁকা হল এযাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ ম্যাদোনার ছবি, সিস্টিন ম্যাদোনা। ২২ নম্বর ছবিটা।

আবারো ব্যারোক

লেখাগুলি লিখতে লিখতে মনে হয় আরে সর্বনাশ, এইটা তো ছেড়ে এসেছি। বলেছিলাম ব্যারোক নিয়ে আর লিখবো না। ১৫ পৃষ্ঠায় ব্যারোক নিয়ে লেখা লিখেছিলাম। আজ যেটা আলাপ করতেই হবে সেটা হচ্ছে ব্যারোক পেইন্টার ডাচ শিল্পী রেমব্র্যান্ট। এর আগে ক্যাভাজ্জিওর ক্রুসিফিকেশন অব সেইট পিটারটা আবার দেখে নিয়েন, তাহলে এই ছবি দেখে মজা পাবেন। আবারো মনে করিয়ে দেই ব্যরোক ধারার ছবিতে থাকে, গতি, আলো ছায়া, ছবির বিষয় যেন আপনার স্পেসে ঢুকে যায় পেইন্টিঙের এই কৌশলকে বলে ফৌরশর্টেনিং, কৌণিক কম্পোজিশন। ব্যাকগ্রাউন্ড কালো, আর ফিগার গুলো অত্যধিক উজ্জ্বল। পুরো ফিগারগুলোকে বাহুল্য ছাড়াই ছবির মূল বিষয়কে দর্শকের মুখের উপরে এনে ফেলে। ২৩ নম্বর ছবি দেখুন।

ছবি নম্বর ২৪: ক্যাথিড্রাল অফ পার্মা - করেজ্জো

এই ছবিটার নাম নাইট ওয়াচ বা রাতের পাহারা। আমস্টার্ডাম নামের একটা বিশেষ জায়গায় রাতের পাহারার জন্য মিলিশিয়ারা জড়ো হচ্ছে। ছবিতে উজ্জ্বল আলো পড়েছে দলনেতা ক্যাপ্টেন আর তার লেফটেন্যান্টের উপরে। দলনেতা লেফটেন্যান্টকে কিছু একটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। দলনেতার হাত দেখুন, যেন আপনার স্পেইসে ঢুকে গেছে। এইটাকেই বলে ফোরশর্টেনিং। দলনেতার হাত এতোই ডিটেইল যে হাতের ছায়া পড়েছে লেফটেন্যান্টের শরীরে।

https://nagorikpathagar.org

পাহারায় যারা থাকেন তাঁদের বলা হতো ক্লভেনিয়ার। ছবির বা দিকে উজ্জ্বল আলোতে বালিকাকে দেখুন, তার কোমরে উল্টো করে ঝুলানো মুরগির পা দেখুন। মুরগির পা, আর বালিকাটি ক্লভেনিয়ারদের প্রতীক। কোথায় ছবিটা আঁকা হয়েছে কাদের নিয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছে সেটা স্পষ্ট করার কৌশল সত্যিই দুর্দান্ত।

কথিত আছে এই ছবিটা মিলিশিয়াদের ক্লাবঘরে টাঙানোর কথা ছিল। কিন্তু অন্য সবার শরীরে আলো না পড়ার জন্য মিলিশিয়া দলের সবাই খুব মন খারাপ করে। এটাও শোনা যায় রেমব্র্যান্টের জীবদ্দশায় এই ছবির জন্য নাকি তাঁকে খুব গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। এমনকি বদনামের কারণে তাঁর আয় রোজগারও কমে যায়। যদিও আজকে রেমব্র্যান্টের এই ছবিটাই কালোত্তীর্ণ হয়ে টিকে আছে।

লেইট ব্যারোক শিল্পী করেজ্জো

করেজ্জো কিন্তু একটা জায়গার নাম, সেই নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন শিল্পী। ব্যারোকে আমরা ফৌরশর্টেনিং এর কথা বলেছি। ব্যারোকের একটা গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক ফৌরশর্টেনিং। করেজ্জো ছিলেন ফৌরশর্টেনিং এর মাস্টার। ফ্রেস্কো আর তেল রঙে দুটোতেই সমান দক্ষ ছিলেন করেজ্জো।

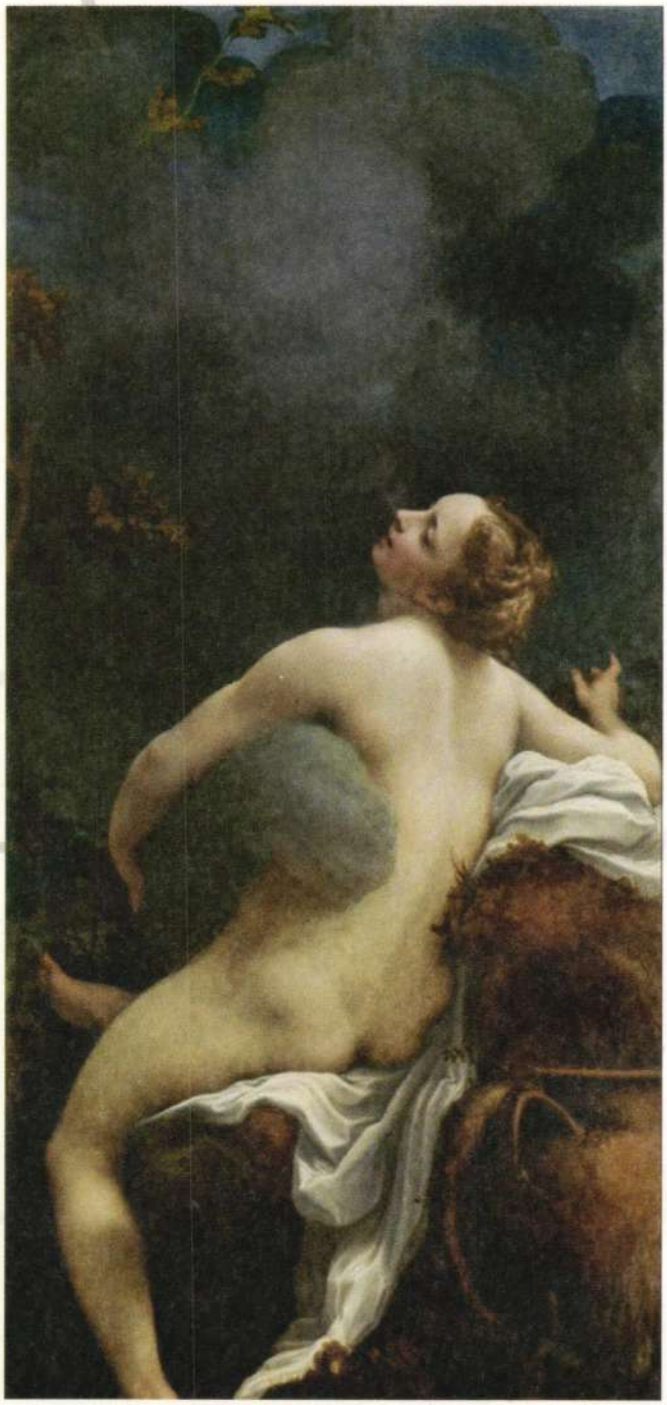

ছবি নম্বর ২৫: জুপিটার এবং ইয়ো- করেজ্জো

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ২৬: এজাম্পসন অফ ভার্জিন - করেজ্জো

ইতালির পার্মার শহরে একটা ক্যাথিড্রালের ছাদে ফ্রেস্কোর একটা দুর্দান্ত কাজ করেন করেজ্জো। আমরা এর আগে গির্জায় ফ্রেস্কোর কাজ দেখেছিলাম রেনেসাঁর মিকেলেঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলে। আর লেইট ব্যারোকের করেজ্জোর কাজটা ছিল আরেক দিক থেকে বিশেষ ধরনের। তিনি গির্জার ডোমে আঁকবেন আকাশে ভেসে বেড়ানো দেবদূতের ছবি, তাহলে আকাশে ভেসে বেড়ানো দেবদূত নিচ থেকে দেখতে কেমন লাগে সেটা বুঝার জন্য তিনি আগে মাটির মডেল তৈরি করে ছাদে ঝুলিয়ে নিচে থেকে দেখতেন কেমন লাগে। নিচে থেকে দেখতে যেমন লাগে, সেইটা স্কেচ করে রাখতেন। করেজ্জো গির্জার ডোমে উড়ন্ত দেবদূতের এমন দুর্দান্ত ইলিউশন তৈরি করেছিলেন যেন মনে হয় সত্যি সত্যিই দেবদূতেরা শুন্যে ভেসে আছেন। ২৬ নম্বর ছবিটা দেখুন, মনে হবে আরে ধুর চার্চের দেয়াল মিথ্যা এই দেবদূতেরাই আসল আর জীবন্ত।

তিশান একবার পার্মার এই ক্যাথিড্রালে এসেছিলেন, করেজ্জোর আঁকা ফ্রেস্কো দেখে নাকি চিৎকার করে বলেছিলেন, এই ডোমগুলো উলটে তাতে সোনা দিয়ে ভর্তি করে দিলেও করেজ্জোর এই ছবির দাম উঠবে না।

করেজ্জোর আরেকটা সিরিজ আছে জুপিটারের ভালোবাসা। মোট চারটা ছবি ছিল এই সিরিজে। গ্রীক দেবতা জুপিটার বা জিউস ছিল আকাশের রাজা এবং দেবতাদের রাজা। তাঁর প্রতীক ছিল ঈগল, এই

https://nagorikpathagar.org

জুপিটার ছিল রোমানদের স্টেট গড, আর সেইজন্যই রোমান আর্মি ব্যবহার করতো ঈগল প্রতীক, এই ঈগল হচ্ছে এখনকার আমেরিকার প্রতীক। এইভাবেই গ্রীক দেবতার চিহ্ন আমেরিকার গনতন্ত্রে জায়গা করে নেয়।

যাই হোক, এই জুপিটারের স্ত্রী ছিল হেরা, এই হেরার চোখ এড়িয়ে জুপিটার মরণশীল মানুষ ইয়োর প্রেমে পড়ে। হেরা যেন এই প্রেম ধরতে না পারে তাই জুপিটার কখনো রাজহাঁস কখনো ঈগল কখনো মেঘ হয়ে ইয়োর সাথে প্রেম করতো। ২৫ নম্বর ছবিতে জুপিটার মেঘ হয়ে ইয়োর সাথে মিলিত হচ্ছে। ইয়ো সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে জুপিটারের কাছে, ইয়োর শরীরে আলো ছায়ার খেলা, এন্ড ইউ ক্যান ফীল দ্য নেক্সট মোমেন্ট।

রোকোকো পেইন্টিং

এবার আরেক ফরাসী ধারার পেইন্টিং; রোকোকো পেইন্টিং। ব্যারোক পেইন্টিং এর যুগের পরে আসে

ছবি নম্বর ২৭: এম্বার্কেশন অব সাইথেরা - আতোয়ান ওয়াতো

https://nagorikpathagar.org

স্বল্পস্থায়ী এই রোকোকো যুগ। রোকোকো ধারায় আঁকা হতো এরিস্টোক্রেসির পেইন্টিং। ১৭ শতকে ফ্রেঞ্চ মনার্কি থেকে উত্তরণ হয়েছে এরিস্টোক্রেসিতে বা অভিজাততন্ত্রে। এরপরেই আসবে ফরাসী বিপ্লব, শুরু হবে এইজ অব এনলাইটেনমেন্ট। এক নতুন আধুনিক যুগের সূচনা। এই রোকোকো যুগের পেইন্টার আতোয়ান ওয়াতো বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর নিদারুণ দারিদ্রে কেটেছে সারা জীবন। দুবেলা খেতেও পেতেন না। একদম শেষ জীবনে কিছুটা সচ্ছলতার দেখা পেয়েছিলেন কিন্তু ততদিনে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে।

কিন্তু অদ্ভুত ওয়াতোর ছবিতে বিষাদের বা দারিদ্রের কোন চিহ্ন ছিলনা। রোকোকো ছবি তো তাই। অভিজাতদের জীবনকে চিত্রায়িত করাই রোকোকো শিল্পীদের কাজ ছিল। এই সময়েই রোম থেকে ইউরোপের কালচারাল ক্যাপিটাল ফ্রান্সে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। তাই ওয়াতোর ছবিতে শুধু হাসি, প্রেম আর আনন্দ। ছবির চরিত্রগুলোও ধনী। এই ছবিটার নাম এম্বার্কেশন অব সাইথেরা। সাইথেরা হচ্ছে গ্রীসের একটি দ্বীপ। এখানেই প্রেমের দেবী আফ্রোদিতে জন্ম নিয়েছিলেন বলে ধরা হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন প্রেমিক প্রেমিকা স্বপ্নের জাহাজে চড়ে সাইথেরা প্রেমদ্বীপে যাবার জন্য তৈরি, প্রেমের দেবদূত কিউপিড ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার উপরে, যেন যুগলদের আরো ঘনিষ্ঠ করে দিতে চায় কিউপিড। দূরে সোনালী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রেমদ্বীপ। রোকোকো ছবির ব্রাশ স্ট্রোক ছিল মোলায়েম, এই ব্রাশস্ট্রোক রোকোকো পেইন্টাররা পেয়েছিলেন ব্যারোক পেইন্টার রুবেন্সের কাছে থেকে।

এই রোকোকোর পরেই আসবে পেইন্টিং এর আধুনিক নিও ক্লাসিক্যাল যুগ।

দাভিদ

২৮ নম্বরের এই ছবিটা একটা বিখ্যাত ফরাসি ক্লাসিক্যাল পেইন্টিং। ফরাসি ক্লাসিক্যাল ধারার প্রবর্তক পেইন্টার দাভিদের আঁকা। ফরাসি বিপ্লবের সেই উত্তাল দিনগুলোতে দাভিদ ছিলেন রাস্তায় বিপ্লবীদের সঙ্গে। বিপ্লবের পরে তিনি দেখলেন বিপ্লব মুক্তি দিয়েছে ঠিকই কিন্তু ফরাসি সমাজের গভীরে রেখে গেছে গভীর ক্ষত। ফরাসি সমাজ বিভক্ত দুই

ছবি নম্বর ২৮: দ্য ইন্টারভেনশন অব স্যাবিন উয়োম্যান

https://nagorikpathagar.org

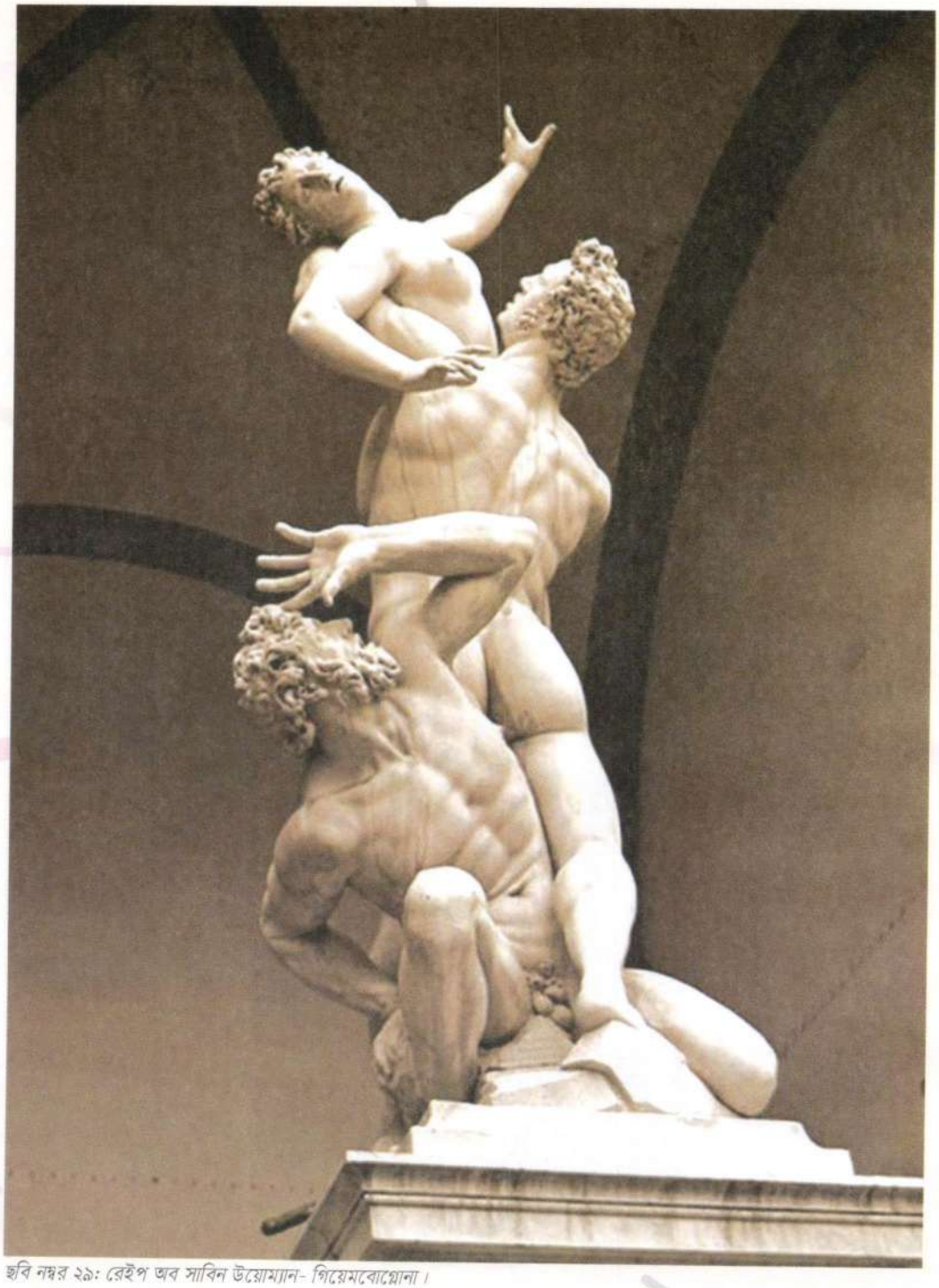

ছবি নম্বর ২৯: রেইপ অব সাবিন উয়োম্যান- গিয়েমবোগ্নোনা।

https://nagorikpathagar.org

দলে। তিনি অনুভব করলেন এই রক্ত হিংসা পেরিয়ে একটা রিকনসিলিয়েশনের দরকার। তাই দাভিদ আঁকলেন এই ছবিটা।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুই দল মারমুখি যোদ্ধাদের মাঝে শিশুপুত্র কোলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একদল গৃহবধু।

এই ছবিটার সুলুক সন্ধান করতে আরেক গল্প শুনতে হবে।

রোমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনে করা হয় রোমুলাসকে। রোমুলাস একটা কিংবদন্তীর চরিত্র। রোমুলাস ও তার যোদ্ধা বাহিনীর সাথে কোন মহিলা ছিলনা। রোমের নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ইচ্ছায় এবং রোমুলাস ও তার যোদ্ধারা বিয়ের জন্য ইতালির সাবিন গোত্রের কাছে তাঁদের কন্যাদের প্রার্থনা করে। সাবিনদের রাজা টিটাস টাটিউস রোমুলাসের আবদারকে নাকচ করে দেন। রোমুলাস তার যোদ্ধাবাহিনী নিয়ে সাবিন আক্রমণ করে এবং সাবিনের কন্যাদের দলবদ্ধভাবে অপহরণ করে। এই মিথলজিক্যাল ঘটনাকে বলা হয় "রেইপ অব সাবিন উয়োম্যান"। এই রেইপ মানে ধর্ষণ মনে করবেন না। রেইপ শব্দটা এসেছে ল্যাটিন থেকে, এর মানে দলবদ্ধভাবে অপহরণ। এই র‍্যাপ্টিও থেকেই রেইপ শব্দটা এসেছে।

এই ঘটনা রেনেসাঁ পেইন্টারদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। অনেক রেনেসাঁ পেইন্টার একই শিরোনামে অনেকগুলো ছবি আঁকেন, ভাস্করেরা বানায় স্থাপত্য। কিন্তু কেন? কারণ হচ্ছে মানুষের শরীরের এক্সট্রিম পসচার এই ছবি আঁকতে গেলে দেখানো যাবে। নারীদের গা মুচড়ে ছুটে পালানোর ভঙ্গি আর পুরুষদের অসুরসম শক্তিতে নারীদের কাধে তুলে পালানো, এসবে শরীরকে, তার বিভঙ্গকে আর গতিকে ধরা যায় দুর্দান্তভাবে। ২৯ নম্বর ছবিটা দেখুন।

যাই হোক, এই ছবিটা অপহরণের পরের ঘটনা। যখন রোমুলাস নিজে টিটাস টাটিউসের কন্যা হারসিলিয়াকে বিয়ে করে, অন্যান্য যোদ্ধারা তাদের জিতে আনা কন্যাদের বিয়ে করে সুখে আছে, বাচ্চাকাচ্চাও হয়ে গেছে। তখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রোম আক্রমণ করে সাবিনেরা। মুখোমুখি সাবিন আর রোমান যোদ্ধারা। সেইসময় সাবিন কন্যারা তাঁদের বাচ্চাকাচ্চাসহ দুই যুযুধান দলের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে। একদিকে তাঁদের পিতা আর ভাইয়েরা, আরেকদিকে তাঁদের স্বামীরা। মাঝের সাদা নারী ফিগারটা হারসিলিয়া রোমুলাসের স্ত্রী আর সাবিন রাজা টিটাস টাটিউসের কন্যা। এক নারী উর্ধ্বে তুলে ধরেছে তার শিশুপুত্রকে যে দুই যোদ্ধা দলেরই উত্তরাধিকার। সেই যৌথ ভবিষ্যৎ এর দিকে তাকিয়ে দুই দলই যুদ্ধ বন্ধ করবে এটাই প্রত্যাশা। যৌথ ভবিষ্যতের জন্যই তো দরকার আলটিমেইট রিকনসিলিয়েশন।

ফ্রান্সের দরিদ্র পেইন্টার

৩০ নম্বর ছবিটা ফ্রেঞ্চ পেইন্টার মিলের আঁকা। নাম গ্লেনারস। গ্লেনার মানে হচ্ছে সেই হতদরিদ্ররা, যারা কৃষক ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যাবার পরে উচ্ছিষ্ট শস্যদানা কুড়ায়।

মিল ছিলেন এক দরিদ্র পেইন্টার। প্যারিসে থাকার সামর্থ্য ছিলনা, থাকতেন প্যারিসের কাছের বার্বেজ এলাকায়। এই ছবিটা বার্বেজ এলাকার একটি ক্ষেতের। সেইসময়ে যেসমস্ত পেইন্টার প্যারিসে না থেকে

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৩০: গ্লেনারস- মিল

আর্থিক কারণে বার্বেজে থাকতেন তাঁদের বলা হতো বার্বেজ পেইন্টার। মিল সেই অর্থে ছিলেন বার্বেজ পেইন্টার।

ছবি নম্বর ৩১: পেট্রেইট- পিয়েরে দেলা ফ্রান্সেস্কো

ছবি নম্বর ৩২: পেট্রোইট - হ্যান্স মেমলিং

বার্বেজ এলাকাটা এখনো আছে, তবে মূল প্যারিসের মধ্যে ঢুকে গেছে সেটা। একটা মেট্রো স্টেশন আছে বার্বেজ হোশোসুয়ে নামে। এখনো এই এলাকায় দরিদ্র মানুষের বাস। মূলত অশ্বেতাঙ্গরা থাকে এখানে। এভেনটিসে যারা ছিলাম আমরা খুব যেতাম বার্বেজে, কারণ, সেখানে একটা দরিদ্রদের জন্য সুপারস্টোর ছিল। নাম ছিল টাটি। ইফতেখারুল ইসলাম নাম

https://nagorikpathagar.org

দিয়েছিলেন তাঁতিবাজার। অবিশ্বাস্য কম দামে সব ধরণের জিনিস পাওয়া যেত। আরেকটা আগ্রহ ছিল, বার্বেজ এলাকার কাছেই মমার্থ, সেখানে এখনো দরিদ্র পেইন্টারেরা আপনার স্কেচ আকার জন্য পেন্সিল আর ক্যানভাস নিয়ে বসে থাকে।

গ্লেনারস ছবিটা আঁকা হয়েছিল সেইসময় যখন আমাদের এখানে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে, ফরাসী বিপ্লব হয়ে গেছে ষাট বছর আগেই, সেই সময়ে এশিয়া আর আফ্রিকায় ফরাসীদেরও কলোনি আছে। তবুও সাধারণ মানুষের দারিদ্র আমাদের ভূখণ্ডের মতই। খুব বেশী সময় আগের কথা নয়। মাঝে একটা শিল্প বিপ্লব ওদের কোথায় তুলেছে, আর আমাদের কোথায় ফেলেছে।

আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে বলবো, উচ্ছিষ্ট শস্যকণা কুড়াচ্ছে মহিলারা। কারণ তারাই তো আমাদের সমস্ত কষ্ট আর যন্ত্রনার বিরুদ্ধে লাস্ট ডিফেন্স। তাঁরা হারে সবার পরে।

বিশ্বসেরা মোনালিসা

এই ছবিটি বিখ্যাত হয় ১৯১১ সালে যখন একজন ইতালিয়ান ছবিটি চুরি করে ফ্লোরেন্সে নিয়ে যায়। প্রায় দুই বছর ছবিটা লাপাত্তা ছিল। যে চুরি করেছিল সে সাফাই গেয়ে বলেছিল যে তিনি একশ বছর আগের নেপোলিয়ানের ইতালি আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কথাটা সত্য, এই ছবিটা নেপোলিয়ান লুট করেই ফ্রান্সে নিয়ে যায়।

ছবি নম্বর ৩৩: মোনালিসার মূল ছবিটা যেমন ছিল দেখতে

ছবি নম্বর ৩৪: লিওনার্দোর মোনালিসা এখন দেখতে যেমন

https://nagorikpathagar.org

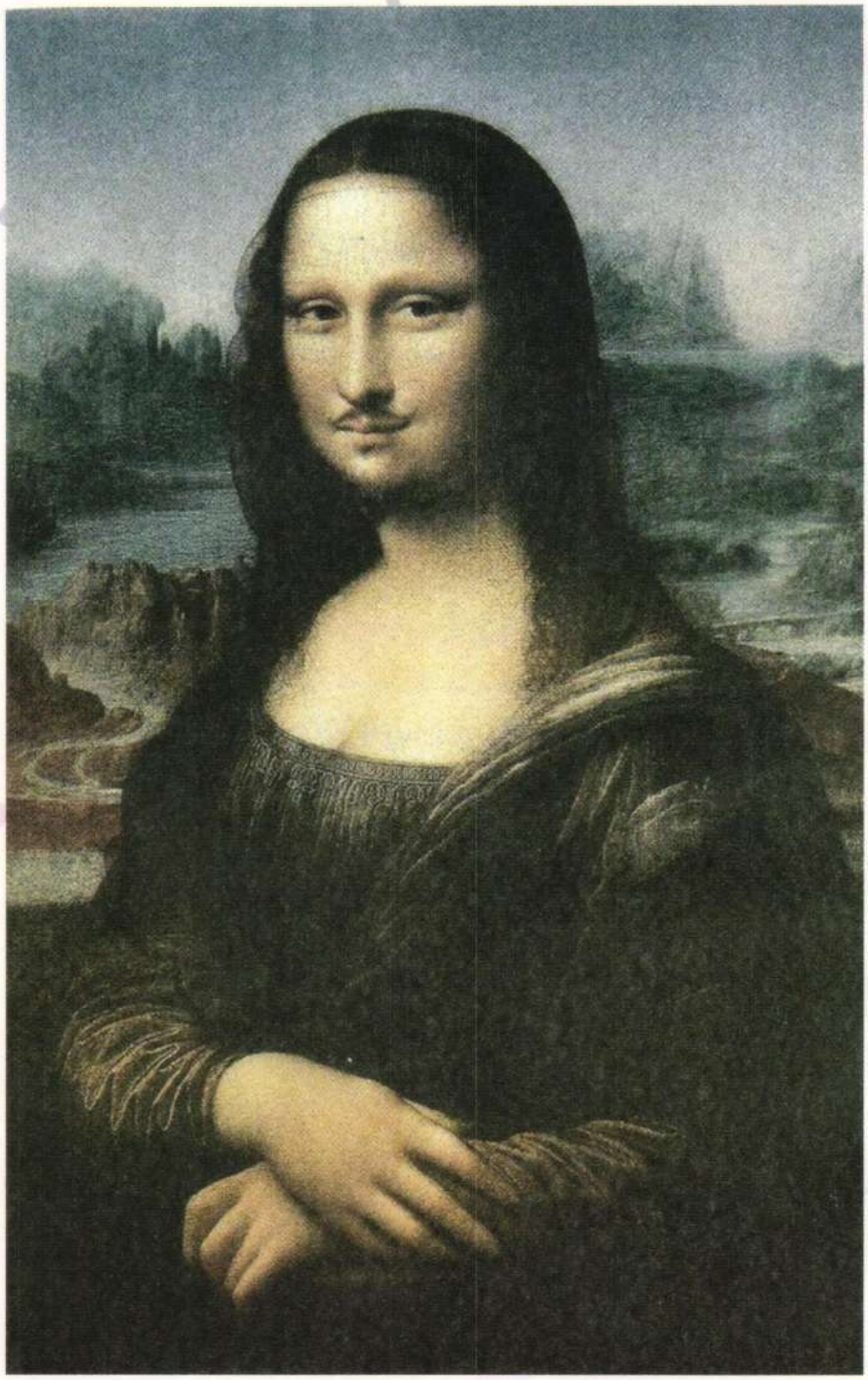

ছবি নম্বর ৩৫: মোনালিসা- দুশ্যাম্প

https://nagorikpathagar.org

এই ছবির অনেক বিশেষত্বের মধ্যে একটা কাছের আর দূরের অনুমান কীভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায় সেটা করে দেখানো। কাছের দৃশ্য আমরা যত স্পষ্ট দেখি দূরের দৃশ্য তত স্পষ্ট দেখিনা, কারণ মাঝে থাকে হাওয়া। উঁচুতে উঠলে হাওয়ার ঘনত্ব কমে যায় তাই দূরের জিনিসও খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এই হাওয়ার গুণ বুঝে উচ্চতার ধারণা দেয়াটা প্রথম আসে ভিঞ্চির পেইন্টিং এ। আর দূরের জিনিস আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিশিয়ে দেয়ার কৌশলটাও ভিঞ্চির আবিষ্কার। এই পদ্ধতিকে বলে স্ফুমাটো। ফিগারের চারপাশে বাতাস আর ফিগারের সংযোগের যে ধোঁয়াটে ভাব এটাই স্ফুমাটো।

আর্লি রেনেসাঁর পোট্রেইট আঁকা হতো পাশ থেকে। ৩১ নম্বর ছবিটা দেখুন আর্লি রেনেসাঁর পিয়েরে দেল ফ্রান্সেস্কোর আঁকা পোট্রেইট। ঠিক এর বিশ বছর পরেই হ্যান্স মেমলিং আঁকলেন ৩২ নম্বর ছবিটা মুখ প্রায় দর্শকের দিকে ফেরানো। আর লিওনার্দো আঁকলেন চোখে চোখ রাখা পোট্রেইট। আর বিশ্বাসযোগ্য একটা স্পেইসে ফিগারটাকে বসানো, পিয়েরে দেল ফ্রান্সেস্কোর ছবিটা দেখুন যেন একটা বার্ডস আই ভিউয়ের

ছবি নম্বর ৩৬: বাইজেন্টাইন পেইন্টিং

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৩৭: ম্যাডোনা উইথ লং নেক- পারমিজিয়ানিনো

https://nagorikpathagar.org

উপরে ফিগারটা চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিঞ্চির এই সময়টা হিউম্যানিজমের, মানুষের জয়গান, মানুষের এচিভমেন্টের জয়গান। এখনই তো মানুষের সময় স্পর্ধিত দৃষ্টিতে ইতিহাসের দিকে তাকানোর।

মোনালিসা ছবিটি তার স্বামীর কাছে দেননি লিওনার্দো। কেন দেন নি জানা যায়না। মোনালিসা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু মোনালিসার যেই ছবি আমরা দেখি সেই ছবিতে তেমন নজর কাড়া সৌন্দর্য ধরা পড়েনা। কারণ মূল ছবির উপরে হলুদ আস্তরণ পড়েছে। কিছুদিন আগে মাদ্রিদের প্রাদোতে একটা মোনালিসার রেপ্লিকা পাওয়া গেছে, আঁকিয়ে অজ্ঞাত। এই ছবির হলুদ আস্তরণ সরিয়ে তো সবাই অবাক। মোনালিসার রূপ লাবন্য ঠিকরে বেরুচ্ছে। ৩৩ নম্বর ছবিটা প্রাদোর আর ৩৪ নম্বর ছবিটা আমরা যেটা দেখি ল্যুভ মিউজিয়ামে। প্রাদোর ছবিটা একই সময়ে আঁকা হয়েছিল তবে এটা লিওনার্দো আঁকেন নাই, এঁকেছেন অন্য কেউ, লিওনার্দোর পাশে বসেই, প্রত্যেকটা ব্রাশ স্ট্রোককে প্রাদোর শিল্পী অনুকরণ করেছেন।

মোনালিসার হাসির একটা ইন্টারপ্রিটেশন করেছিলেন ফ্রয়েড। ফ্রয়েডের মতে হাসিটায় আছে দ্বৈতভাব, একদিকে মায়ের মতো মমতাময়ী আরেকদিকে প্রেমিকার মতো যৌনাবেদনময়ী।

উনিশ শতকের ফ্রেঞ্চ অ্যামেরিকান পেইন্টার দুশ্যাম্প মোনালিসার একটা কপি এঁকেছিলেন, দাঁড়ি গোফ দিয়ে। আমরা সাধারনত স্কুলে এমন দুষ্টুমি করে থাকি। কিন্তু দুশ্যাম্প দুষ্টুমি করে আঁকেননি। সিরিয়াসলি এঁকেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন মোনালিসার মধ্যে খানিকটা পুরুষালী ভাব আছে। সেটাকে প্রকাশ করার জন্যই দাড়ি গোফের আমদানি। ৩৫ নম্বর ছবিতে দেখুন।

তবে তখন প্রাদোর মোনালিসা আবিষ্কার হলে দুশ্যাম্প তার মত বদলাতেন এটা নিশ্চিত। দুশ্যাম্পের ছবি নিয়ে আমরা যথাসময়ে আলাপ করবো।

এল গ্রেকো, সেজান আর পিকাসোর প্রেরণা

এক গ্রেকো কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়। আসল নাম ডমিনিকো থিয়োটকপুলি। এতো বড় নামে ডাকা মুস্কিল তাই তাঁকে ডাকা হতো এল গ্রেকো। স্প্যানিশ ভাষায় এর মানে "গ্রীক লোকটা"। গ্রেকো গ্রীসের ক্রিট দ্বীপে জন্মেছিলেন আর ঘাটি গেড়েছিলেন স্পেনে তাই নামের এই দশা। ক্রিট থেকে তিশানের কাছে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন তারপর অনেক দিন তাঁর খোঁজ কেউ পায়নি, পরে স্পেনের টোলেডোতে তাঁকে খুঁজে পায় সবাই। এল গ্রেকোর ছবি একটা বিশেষ ধারার ছবি, এই ধারাকে বলা হয় ম্যানারিস্ট ধারা। হাই রেনেসাঁর পরে আর ব্যারোকের আগে একটা স্বল্প সময় এই ম্যানারিস্ট ধারার ছবি আঁকা হতো। হাই রেনেসাঁ যেমন ব্যালান্স, প্রোপরশন আর আইডিয়াল বিউটি ফুটিয়ে তুলতো ম্যানারিস্টরা সেই গুন বা কোয়ালিটিগুলোকে বহুগুনে বর্ধিত করতো।

৩৭ নম্বর ছবিটা দেখুন ম্যাডোনার, লম্বা গলা, কোলের যীশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বিশাল বিশাল। বাইজেন্টাইন পেইন্টিং (৩৫ নম্বর ছবি) এর ধারা থেকে ম্যানারিস্টরা এই ধারা পেয়েছিল। বাইজেন্টানিয় পেইন্টিংই প্রথম এবস্ট্র্যাক্ট পেইন্টিং এর আবিষ্কর্তা। বাইজেন্টাইন পেইন্টিং এর মূল বৈশিষ্ট্য এন্টি ন্যাচারিলিস্টিক, মানে যা স্বাভাবিক নয় ঠিক তেমন করে দেখানো। শরীরকে লম্বা করে দেখানো, অঙ্গকে লম্বা করে দেখানো। নিছক

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৩৮: এডোরেশন অব দ্য শেফার্ড- এল গ্রেকো

https://nagorikpathagar.org

রক্ত মাংসের মানুষের প্রতিকৃতি নয় বরং সেই দৃশ্যমান জগতের আর মানুষের ভিতরের প্রকৃত ভাবটাকে ধরার চেষ্টা। মানে রক্তমাংসের ভিতরে প্রাণ বা আত্মাটাকে ধরার চেষ্টা। মিকেলেঞ্জেলো যদিও রেনেসাঁ শিল্পী কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য ডেভিডে আছে ম্যানারিস্ট ছাপ। বিষ্ণু দের একটা কবিতায় আছে "টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া"। সেটা এই স্প্যানিশ গ্রীক শিল্পী এল গ্রেকো। আর এই অদ্ভুত শব্দগুচ্ছের মানে নিশ্চয় এখন ধরতে পারছেন!

বিষ্ণু দের কবিতাটার নাম- সর জি-পি-র গান

বেগেনিয়া ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও সুপারিতাল,
ম্যাগনোলিয়ার পাপড়ি খসায় রূপালি আঁকা।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্দবাদি বেতাল।
গায়ে ফোটে যে এ স্প্যানিশ গরম, গীটার-গীতে
নরম দেহের ইশারা বিছায় আঙুর -ক্ষেতে।
আলহাম্ ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া!
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।
চীনে জুঁই কবে ফুটবে কে জানে স্বদেশী বেল!
রজনীগন্ধা, উজ্জয়িনীর মধ্যে-ক্ষামা!
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাবসি মেঘের কঠিন শেল।
হে পর্জন্য! ঐরাবতেরা দোলাক শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও আমলকী আর নিমের ডাল।
ভেঙে যাক ঝড়ে ল্যাম্পপোস্টের কাঁচের ঢাকা।
হে ত্রিশূলপাণি কোথায় বিশপঁচিশ বেতাল!

বাইজেন্টাইন শিল্পের ধারা আবার ঋণী গ্রীক শিল্পকলার কাছে। তাই এল গ্রেকো এভাবেই আঁকবেন সেটা মনে হয় অবধারিত ছিল।

৩৮ নম্বর ছবিটা এল গ্রেকোর বিখ্যাত একটা ছবি এডোরেশন অব দ্য শেফার্ড। যীশু জন্ম নিয়েছেন আর মেষ পালকেরা এসে শিশু যীশুকে দেখে তৃপ্ত হচ্ছে। আকাশে দেবদূতেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। শিশু যীশু মাতা মেরীর কোলে ছবির কেন্দ্রে, সবচেয়ে আলোকিত, ছবির সবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যীশু যেন একটা অগ্নিপিণ্ড মেরীর পোশাকটা যেন আগুনের শিখা, ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, আর সবাই যেন আগুন পোহাচ্ছে। যীশুর অতীন্দ্রিয় শক্তি তাঁর শরীর থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে, আর আগুনের উত্তাপের মত সবাই সেটা শুষে নিচ্ছে।

এই হচ্ছে গ্রেকোর মায়া, যেখান থেকে পিকাসো নিয়েছিলেন ফ্লুইড ডিস্টরশন, আর তৈরি করেছিলেন কিউবিজম আর সেজান নিয়েছিলেন গ্রেকোর রঙ আর তৈরি করেছিলেন পোস্ট ইম্প্রেশনিজমের আরেক মায়া।

https://nagorikpathagar.org

দাভিদ যেভাবে এনলাইটেনমেন্টের বিপদ দেখেছিলেন

আমরা এর আগে দাভিদের আরেকটা ছবি দিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে যেই ছবিটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা এনলাইটেনমেন্টের ক্রিটিক বুঝার জন্য খুব জরুরী। ছবিটা আঁকা হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের ঠিক চার বছর আগে। তৈরি হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা, দেশ, দেশপ্রেম, নেশন স্টেইটের ধারণাগুলো অঙ্কুরিত হচ্ছে, চারিদিকে যুক্তির বিজয়। এমন সময় আঁকলেন ছবিটা দাভিদ; নাম ঔথ অব দ্য হোরাট্টি। দাভিদ তার বিষয় বেছে নিতেন গ্রিস বা প্রাচীন রোমের ইতিহাস থেকে, আর তাকে দুধর্ষ মুনশিয়ানায় সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক ইস্যু মোকাবেলার বিষয় করে তুলতেন।

রোমের আদিকালে রোম এবং তাঁর পড়শী এলবা সিটির দুই গোত্রের মধ্যে সারাক্ষণ যুদ্ধ লেগে থাকতো।

ছবি নম্বর ৩৯: ঔথ অব দ্য হোরাট্টি- দাভিদ

https://nagorikpathagar.org

শেষে তাঁরা ঠিক করলো দুই নগরের সব মানুষ যুদ্ধ না করে দুইপক্ষের তিনজন করে বাছাই যোদ্ধা পরস্পর যুদ্ধ করবে। যারা জিতবে তারাই যুদ্ধে জিতেছে বলে ধরে নেয়া হবে। রোমান সাইডে হোরাট্টির ভাইয়েরা রোমের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য নির্বাচিত হয়।

হোরাট্টির ভাইদের বাবা যুদ্ধে যাবার আগে তরবারি তুলে দেয়ার সময় শপথ নেয়াচ্ছে পুত্রদের, তাঁরা যেন আমৃত্যু নগরের সম্মানের জন্য বীরের মত লড়ে। হোরাট্টি পরিবারের ফোকাস হচ্ছে পিছনে মাথা নুইয়ে নীল স্কার্ফ পরা কন্যাটি, যার স্বামী নির্বাচিত হয়েছে এলবার পক্ষে যুদ্ধে লড়ার জন্য। একদিকে ভাইয়েরা লড়বে আরেকদিকে স্বামী। ভাইদের বিজয়ে হোরাট্টির কন্যার বিজয় সূচিত হবেনা, এমনকি হোরাট্টি কন্যার স্বামীর বিজয়েও হোরাট্টি কন্যার কোন বিজয় হবেনা। যুক্তিশাসিত অনাগত সেই এনলাইটেনমেন্টের যুগে যেই জিতুক পরাজিত হবে মানবিক সম্পর্কে, আবেগ, ভালোবাসা, যেগুলো যুক্তির জগতের বাইরের জগত। ছবির পশ্চাৎপটে তিনটা ডরিক শক্ত খিলান, খিলানের পিছনেই ভয় ধরানো অন্ধকার; হোরাট্টি ভাইয়েরাও তিনজন, এ যেন অনাগত সেই রাষ্ট্রশক্তির তিন স্তম্ভ- নির্বাহী, বিচার আর আইনসভা।

হোরাট্টি ভাইয়েরা যুদ্ধে জিতে ফিরে আসে, উল্লসিত হয় রোম, একা হোরাট্টি কন্যাকে ক্রন্দনরত দেখে ক্ষিপ্ত হয় ভাইয়েরা, হত্যা করে তাদের বোনকে।

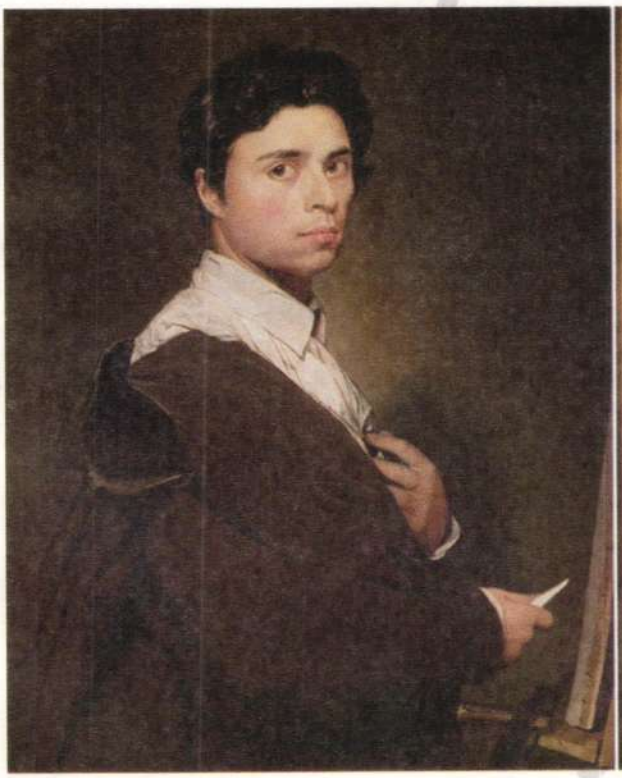

ছবি নম্বর ৪০: ইনগ্রিসের সেলফ পোর্টেইট: দেলাক্রোয়া

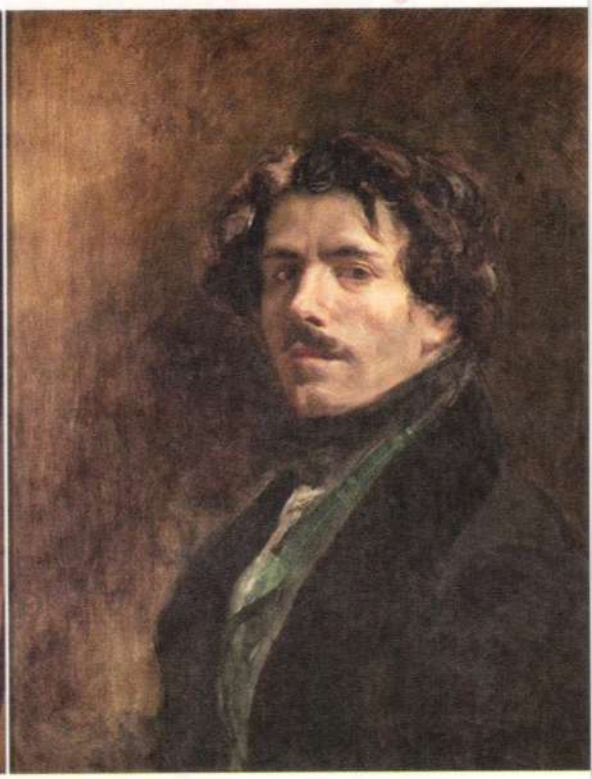

ছবি নম্বর ৪১: দেলাক্রোয়া

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৪২: লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল - দেলাক্রোয়া

আমাদের আবেগ, ভালোবাসা, সম্পর্ক সেই থেকে রক্তাক্ত আর নিহত হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের যুক্তি শাসিত লোহার খাঁচায়। মানুষের সেই খাঁচা থেকে এখনো মুক্তি মেলেনি।

দেলাক্রোয়ার রোমান্টিসিজম

দাভিদের নিও ক্লাসিসিজমের পরে এলো দেলাক্রোয়ার রোমান্টিসিজম। নিও ক্লাসিসিজমে পেইন্টারেরা রেখার উপরে ছবির কম্পোজিশন তৈরি করতেন, আর রোমান্টিসিজমে রেখার উপরে রঙ চরিয়ে রেখাকে অস্পষ্ট করে রঙকে কম্পোজিশনের প্রধান বিষয় করে তুলতেন। ৪০ নম্বর ছবিটা ক্লাসিসিজমের, ঝকঝকে রেখার কাজ, এটা দাভিদের ছাত্র নিও ক্লাসিসিজমের শেষ পেইন্টার ইনগ্রিসের সেলফ পোর্ট্রেইট; আর ৪১ নম্বর ছবিটা দেলাক্রোয়ার নিজের। পাশাপাশি দুই ধারার ছবির বৈশিষ্ট্য বুঝতে এই দুটো ছবি খুব চমৎকার উদাহরণ।

রোমান্টিসিজম ছিল ক্লাসিক্যাল চিত্ররীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁরা গ্রিক রোমানদের ছবি আঁকায় কোন সার্থকতা দেখলেন না, তাঁরা চাইলেন তাঁদের আশেপাশে যা ঘটছে তার ছবি আঁকতে। দেলাক্রোয়া বললেন, ক্লাসিক্যাল রীতি হয়ে উঠেছিল চিত্রশিল্পে সব রকম প্রগতির বিরুদ্ধে জগদ্দল পাথর। এটাকে উৎপাটন করতেই হবে। আবার সেই সময়ে সত্যিই শুরু হল ফরাসী বিপ্লব। দেলাক্রোয়া তার বাসার জানালা দিয়ে রাজপথে তিনদিনের রক্তাক্ত বিপ্লব দেখলেন, আঁকলেন সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছবি, লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল বা "মুক্তি জনতাকে চালিত করছে"। দেলাক্রোয়া গ্রিক মাইথোলজির ছবি রোমান ইতিহাসের ছবি আঁকতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তার ছবিতে গ্রিক আর রোমান আইডিয়াতে ভরপুর। সেটা কীভাবে তা এখন দেখবো।

আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রতীকে ফিগরিয়ান ক্যাপ

এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র মাঝের আলুলায়িত নারী, যার এক হাতে রাইফেল আরেক হাতে ফরাসি রিপাবলিকের পতাকা।

https://nagorikpathagar.org

সে জনতাকে পথ দেখিয়ে ব্যারিকেইড ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে; সেই মুক্তি বা লিবার্টি। তার মাথায় একটা ক্যাপ, এটাকে বলে ফিগরিয়ান ক্যাপ। এটা পরতো রোমানেরা, রোমান দাসদের মুক্তি দেয়া হলে তাকে সেই মুক্তির চিহ্ন হিসেবে একটা ফিগরিয়ান ক্যাপ দেয়া হতো, সে সেটা পরে রাস্তায় গর্বের সাথে হেটে যেত। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর প্রতীক যেটা ছিল তাতে এই ফিগরিয়ান ক্যাপ আছে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে। নারী চরিত্রটি পাশে মুখ ফিরিয়ে আছে, গ্রেকো রোমান সম্রাটদের ছবি যেভাবে কয়েনে থাকতো ঠিক সেভাবে। এই মুক্তিই এখনকার শাসক। নারীর ছবিটার উর্ধাংশ অনাবৃত, এটাও গ্রেকো রোমান স্থাপত্যের উত্তরাধিকার, যেখানে আইডিয়াল ফর্ম নগ্ন করে উপস্থাপন করা হতো। মুক্তি কোন মানুষ নয় এই মুক্তি একটা আইডিয়া, মানুষের শ্লীলতার ধারণা থাকে, আইডিয়া সব সময়েই নগ্ন। ছবির উজ্জ্বল রঙ এর ধারণাও দেলাক্রোয়া নিয়েছিলেন আরেক গ্রিক শিল্পী এল গ্রেকোর কাছে থেকে।

ছবির কম্পোজিশন রেনেসাঁর আগের পিরামিডের মতো। একটা পিরামিডের আকারে ফিগারগুলো সাজানো। ছবির নিচে বাঁ দিকে রাতের পোশাকে নগ্ন এক মৃতদেহ। ফরাসি বিপ্লবের আগে বিরোধীদের এভাবেই ঘরে ঢুকে হত্যা করে নগ্ন করে রাস্তায় ফেলে রাখা হতো যেন সবাই ভয় পায়। শুধু বিপ্লবীর মৃতদেহ নয় সরকারী বাহিনীর দুই সদস্যের মৃতদেহও পড়ে আছে পাশেই। এই বিপ্লব বুর্জোয়াদের, টপ কালো হ্যাট পরা সুবেশ ও ধনী মানুষ আছে যেমন রাইফেল হাতে ঠিক তার পাশেই আছে এক শ্রমজীবী মানুষ তলোয়ার হাতে। আরেক পাশে আছে এক ছাত্র দুইটা পিস্তল দুই হাতে ধরে। পশ্চাৎপটে পুড়ছে প্যারিস। এক আহত তরুণ মুক্তির দিকে তাকিয়ে আছে, ওটাই আহত ফ্রান্স, তার শরীরে সেই পতাকার তিনরঙা পোশাক, সাম্য, ভাতৃত্ব, স্বাধীনতা; যে বিপ্লবের পরে নতুন শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে।

শুরু হবে মানুষের ইতিহাসের এক নতুন কালপর্ব।

ভেনিসের চিত্রকরেরা আর তিন্তোরেত্তো

ভেনিসের ছয়জন চিত্রশিল্পীর কথা না বললে, চিত্রকলার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজনের নাম বেল্লিনি, বড়ই অদ্ভুত। বড় বেল্লিনির দুই ছেলের নামও বেল্লিনি, পিতা পুত্রের এই ট্রায়ো সমানভাবে বিখ্যাত। বেল্লিনির এক পুত্রের ছাত্র ছিলেন জর্জনে আর তিশান, এই হল পাঁচজন, আর ছিলেন তিন্তোরেত্তো। এই তিন্তোরেত্তোর কথা প্রথম শুনি ফেলুদা পড়তে গিয়ে, একটা ফেলুদা কাহিনীর নাম ছিল তিন্তোরেত্তোর যীশু। জমজমাট এই গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে পরে সিনেমাও হয়েছে। সে যাই হোক, এই ভেনিশিয়ান পেইন্টারদের বিশেষ করে জর্জনে আর তিশানের একটা বড় কাজ ছিল ভেনিসের বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকার। তিন্তোরেত্তো নিজেও এঁকেছিলেন দেয়ালে, চটের উপরে এঁকে দেয়ালে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছিলেন তাঁর এক পেইন্টিং। ভেনিস যারা গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই নোনা আবহাওয়ায় দেয়ালের আস্তরই থাকেনা এই পেইন্টিং থাকবে কীভাবে? নেই কোনটাই, সেগুলো আমাদের দেখার সৌভাগ্য হবেনা কখনো।

যাই হোক তিন্তোরেত্তোর যেই ছবিটা নিয়ে আলাপ করবো সেটার নাম মিরাকল অব দ্য স্লেইভ (৪৩ নম্বর ছবি)। ঘটনা এইরকম, এক খ্রিস্টান দাস তার মনিবের হুকুম অগ্রাহ্য করে ভেনিসে যায় সেইন্ট মার্কের

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৪৩: মিরাকল অব দ্য স্লেইভ - তিন্তোরেত্তো

দেহাবশেষ দেখতে। দাস ফিরে আসার পরে, তার মনিব (ডানদিকে টাকমাথা, লাল আলখাল্লা পরে যিনি) রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ঘোষণা করে, এই দাসের চোখ গেলে দেয়া হবে, দেখি তোকে সেইন্ট মার্ক বাঁচায় কীভাবে। দাস বলে, আমার এই দেহ আমি সেইন্ট মার্ককে দিয়েছি, আমার ভয় কী? চোখে গজাল ঢুকাতে গেলে গজাল ভেঙে যায়। মনিব হুকুম করে, কুঠার দিয়ে ওর পা কেটে নাও, কুঠার যায় ভেঙে। এর পরে বলে হাতুড়ি দিয়ে মুখ ভেঙে দাও, যেন সেইন্ট মার্ককে ডাকতে না পারে, হাতুড়ি ভেঙে যায়। যে হাতুড়ি দিয়ে মুখ ভাঙতে গিয়েছিল সে তার ভাঙা হাতুড়ি মনিবকে দেখাচ্ছে। সবাই বিহ্বল, এই সময়টাকে ধরতে ছবিটা আঁকা হয়েছে।

সেইন্ট মার্ক শূন্যে ভাসছেন, তার প্রিয় ভক্তকে বাঁচাতে তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেনা, শুধু বামদিকে মায়ের কোলে শিশুটি ছাড়া, সে পবিত্র তাই সে স্বর্গীয় বস্তু দেখতে পায়। এই ছবিতে ফৌরশর্টেনিং আর পার্সপেক্টিভের কাজ দুর্দান্ত। ফৌরশর্টেনিং করা হয়েছে সেইন্ট মার্কের দেহে, আর ছবির বিলীন বিন্দু মিলেছে সেইন্ট মার্কের মাথার স্বর্গীয় দ্যুতিতে। খ্রিস্টানরাও যে পারসিকিউটেড

https://nagorikpathagar.org

হয়েছে একসময় সেটা আজকের পশ্চিম মনে হয় ভুলে গেছে।

আরেকটি মজার কাজ করেছেন তিন্তোরেত্তো এই ছবিতে, তিনি একইসাথে অতীত আর ভবিষ্যৎ কে ধরেছেন। একদম বাঁয়ের দাড়িওয়ালা মানুষটাকে দেখুন, এই ছবির কেউ নয়, পোশাক আলাদা, এমনকি এই ছবির স্পেসেও নেই লোকটা, দুর থেকে দেখলে মনে হবে সে ছবিটা দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠিক আমাদের মতো। হ্যাঁ, ওটা আপনার আমার ছবি, আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছবি; যেই অনাগত ভবিষ্যতের মানুষকে তিন্তোরেত্তো তখন তাঁর মনের চোখে দেখে সেদিনই তাঁর ছবিতে এঁকে রেখেছিলেন।

ছবি নম্বর ৪৪: থ্রি ফিলোসফার - জর্জনে

https://nagorikpathagar.org

ভেনিশিয়ান রেনেসাঁ পেইন্টার জর্জনে

জর্জনের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি মনে হয় দ্য টেম্পেস্ট; সেখানে দেখা যায় এক যাযাবর মহিলা এক ঝড়ো পরিবেশে বাচ্চাকে স্তন্যপান করাচ্ছেন আর দূর থেকে এক রাখাল বালক তা অবাক বিস্ময়ে দেখছে। জর্জনের ছবিতে কী বলতে চেয়েছেন সেটা নিয়ে এখনো শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যে তর্ক হয়। আমার মনে হয় সেকারণেই জর্জনের ছবির বিষয়ে আমাদের আগ্রহ কখনো কমবে না। তবে জর্জনের দ্য টেম্পেস্ট ছবিটার চাইতে আমার পছন্দ থ্রি ফিলোসফার (৪৪ নম্বর) পেইন্টিংটা। এটা আমাদের মর্ডানিজম আর সেই মর্ডানিজম কার কাছে কীভাবে ঋণী সেটা এই পেইন্টিং এ দুধর্ষ মুনশিয়ানায় ধরেছেন জর্জনে। দর্শন নিয়ে এর চেয়ে ভালো পেইন্টিং আছে কিনা আমার জানা নেই।

এই পেইন্টিং এ তিনজন ফিগার। তিন ফিগার তিন বয়সের; এই তিনজন দার্শনিক তিন যুগের দার্শনিক ধারার প্রতিনিধি। একদম ডাইনে সবচেয়ে বৃদ্ধ তিনি গ্রীক দর্শনের প্রতিভূ তাঁর হাতে কাগজ আর মাপজোকের যন্ত্র, সেই কাগজে কিছু জ্যামিতিক ফর্ম আঁকা আছে। আবার একদম বায়ের ফিগার সবচেয়ে তরুণ, তাঁর হাতেও মাপজোকের যন্ত্র এবং কাগজ যেখানে সে লিখবে এখনো লেখা শুরু করেনি, এই ফিগার ইউরোপ। আর মাঝের ফিগার? সেটা মুসলিম আরব, যারা গ্রীক দর্শনকে পুরো মধ্যযুগে পরম মমতার সাথে চর্চা করেছে এবং শেষে তুলে দিয়েছে ইউরোপের হাতে। আজকে যে গ্রীক দর্শন দেখি সেটা অ্যারাবিক থেকে ল্যাটিনে অনুদিত হয়ে তারপরে আমাদের কাছে এসেছে। মাঝের ফিগার মধ্যবয়সী, তাঁর হাতে কিছু নেই, কারণ সে গ্রীক দর্শনের লজিক চর্চা করলেও গ্রহণ করেনি, করলে আজকের মর্ডানিজম ইউরোপ নয় আরবের হাত ধরেই গড়ে উঠতো। ভাগ্যিস সেটা হয়নি। গ্রীক আর ইউরোপ তাকিয়ে আছে প্রায় একই দিকে, কারণ তাদের চিন্তার গতিমুখ একই, আর আরব তাকিয়ে আছে একদম ভিন্ন দিকে, উল্টোদিকে নয়, কারণ তাঁর চিন্তার গতিমুখ গ্রীক বা ইউরোপের মত নয়।

এবার তরুণ ইউরোপ, তাকিয়ে আছে একটা অন্ধকার গুহার দিকে। যারা প্লেটোর রিপাবলিক পড়েছেন, তাঁরা জানেন প্লেটোর সেই বিখ্যাত মেটাফর অন্ধকার গুহা যা দিয়ে তিনি আজকের লজিক্যাল সমাজকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, সেই লজিক্যাল যুক্তির সমাজ গড়বে তরুণ ইউরোপ, তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে; এরপরেই আসবে এনলাইটেনমেন্ট, পিছনে দেখুন আলো ফুটছে। পৃথিবী বন্দী হবে আরো কয়েকশো বছরের মধ্যে যুক্তি শাসিত আধুনিকতার লোহার খাঁচায়।

আর আমাদের মুক্তির নিশানা আছে এই ছবিতেই, মর্ডানিজম বা আধুনিকতাকে কীভাবে অতিক্রম করে যাওয়া যাবে। মাঝের মুসলিম আরব দার্শনিককে দেখুন, ভাবতে থাকুন, ঠিক কেন মুসলিম আরব দার্শনিকেরা গ্রীক লজিক গ্রহণ করেনি? নিশানা আছে সেখানেই, আমরা এতোদিন সেটা নজরে আনিনি।

https://nagorikpathagar.org

ডাচ ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং; এনলাইটেনমেন্টকে উৎসাহ নিয়ে স্বাগত

ছবি নম্বর ৪৫: ভিউ অব হারলেম উইথ ব্লিচিং গ্রাউন্ডস - রুইসডিয়েল

এই ছবিটার নাম ভিউ অব হারলেম উইথ ব্লিচিং গ্রাউন্ডস। এঁকেছেন সতেরো শতকের ডাচ পেইন্টার রুইসডিয়েল। এই সময়টাতে চলছিল ব্যারোক ধারা। ছবিটার ব্যারোক পেইন্টিং এর গতি দৃশ্যমান। আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি, আলো আর ছায়ার বিন্যাস। আলো থেকে ছায়া আবার আলো আবার শেষে শহরের দিগন্তে মেলানো দৃশ্য আর উপরে অবারিত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ; যেন চোখকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেনে নিয়ে যায়।

এর আগে পেইন্টিং এ ল্যান্ডস্কেপ এসেছে মূল ফিগারের অনুষঙ্গ হিসেবে কিন্তু এই প্রথম ল্যান্ডস্কেপ এলো মূল বিষয় হিসেবে। এই ছবিতে দূর থেকে হারলেম শহর দেখা যাচ্ছে, ছবিটা যেন আঁকা হয়েছে গ্রাম থেকে। গ্রাম কীভাবে শহরকে দেখছে। হারলেমের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সেইন্ট বাভোর চার্চ, যা এখনো আছে (৪৬ নম্বর ছবিতে)। সেই চার্চ পশ্চাৎপটে দৃশ্যমান। এই ছবির মূল অংশটা হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। রেনেসার ল্যান্ডস্কেপে আলো বা ছায়া থাকতো না, সেগুলো ছিল নিপুনভাবে সূর্যের আলোয় আলোকিত আর চির বসন্ত। এই প্রথম পৃথিবী ল্যান্ডস্কেপে ওয়েদার দেখলো, সময় দেখলো।

ছবি নম্বর ৪৬: সেইন্ট বাভোর চার্চ

গ্রামের মাঠে লিনেন মেলে দেয়া আছে, লিনেনকে রোদের আলোতে ব্লিচ করতে হয়। তাই গ্রামের মাঠে লিনেন ব্লিচ করতে দেয়া হয়েছে। গ্রাম থেকে যাবে রসদ শহরে।

https://nagorikpathagar.org

শহরের আলোই যেন গ্রামে এসে পড়েছে কোন কোন জায়গায়। এই আলো এনলাইটেনমেন্টের আলো। রোদের আলো ছায়ার মুনশিয়ানা দেখুন, শহর আলোকিত, লিনেন কারখানা আলোকিত, বসতবাটি বা সমাজ ছায়াচ্ছন্ন। শিল্পীর কল্পনায় চার্চকেও সে এনলাইটেনমেন্টের সঙ্গী হিসেবে চায়। এই আলো ছায়ায় শহর অর্থাৎ নগরায়ন বা শিল্প বিপ্লব দাঁড়িয়ে থাকে শক্তি নিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা হিসেবে।

এই আলো ছায়ার ল্যান্ডস্কেপের নিরীক্ষাই ইংল্যান্ডের কনস্টেবলের হাত ধরে ভবিষ্যতে ফ্রান্সে জন্ম দেবে জগত কাঁপানো ইম্প্রেশনিজমের ধারা।

জর্মন রেনেসাঁ পেইন্টার ডিউরর

আলব্রেক্ট ডিউরর ছিলেন জর্মন রেনেসাঁ পেইন্টার। পেইন্টার না বলে ডিউররকে আরো অনেক কিছুই বলা যায়। ডিউরর ছিলেন কাঠ খোদাই আর এনগ্রেভিং এর মাস্টার। পৃথিবীতে তাঁর মতো কাঠ খোদাই আর এনগ্রেভিং কেউ করতে পেরেছে কিনা জানা নেই। কাঠ খোদাইয়ে (৪৭ নম্বর ছবি) যেই জায়গাটা কালো হবে সেই জায়গাটা উঁচু রেখে বাকি জায়গাটার কাঠ খোদাই করে চেঁছে ফেলে দিতে হয়, তারপরে কাঠের সেই প্লেটে কালো রং লাগিয়ে কাগজে ছাপ দিয়ে অসংখ্য কপি তৈরি করা হয়। কাঠ খোদাইয়ে সূক্ষ্ম রেখা তৈরি করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ খুব বেশী চিকন রেখা তৈরি করতে গেলে চাপ লেগে কাঠের সেই রেখা ভেঙে যেতে পারে। যদিও ডিওররের এই কাঠ খোদাইয়ে রেখার কাজ দুর্দান্ত।

ছবি নম্বর ৪৭: ফোর হর্স ম্যান অফ এপোক্যালিপ্স - আলব্রেক্ট ডিউরর

এনগ্রেভিং এ আরো অনেক সূক্ষ্ম রেখা তৈরি করা যায়। কারণ এনগ্রেভিং করা হয় ধাতব প্লেটে। যেই অংশটা কালো হবে সেটা খুঁদে নিচু করে দেয়া হয় এই গর্তগুলোতে রং ঢেলে ধাতব পাতটা কাগজের উপরে ঠেসে ধরা হয়, তৈরি হয় ছবির প্রিন্ট। এনগ্রেভিং এর পদ্ধতি কাঠ খোদাইয়ের উল্টো; (৫০ নম্বর ছবি) দেখুন। এনগ্রেভিং এ অনেক সূক্ষ্ম রেখা তৈরি করা যায় আর এমন কি আলো ছায়ার কাজ করা সম্ভব। ডিউররের সময়ের বছর পঞ্চাশেক আগে ছাপাখানা শুরু হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে অনেক

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৪৮: ফোর এপোসলস - আলব্রেক্ট ডিউরর

ছবি নম্বর ৪৯: ফোর এপোসলস - আলব্রেক্ট ডিউরর

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৫০: উডকাট অফ মেলাঞ্চলিয়া - আলব্রেক্ট ডিউরর

https://nagorikpathagar.org

কিছুর উপরে, এমনকি চিত্রকলাতেও। এই সময়েই সেরা এনগ্রেভিং আর কাঠ খোদাইয়ের কাজগুলো হতে থাকে আর ছড়িয়ে পড়তে থাকে নানা দিকে।

ডিউরর পেইন্টিং শিখেছিলেন ভেনেশিয়ান পেইন্টারদের কাছে থেকে। দীর্ঘ সময় ভেনিসে ছিলেন। ডিউরর নাকি খুব সূক্ষ্ম রেখা আঁকতে পারতেন, একদম মাকড়সার জালের মতো। তিনি যখন ভেনিসে যান তখন বেল্লিনি বৃদ্ধ। বেল্লিনি বললেন ডিউররের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তিনি চুল আঁকেন যেই তুলিতে তাঁর একটা বেল্লিনিকে দিতে পারেন কিনা? ডিউরর একটা তুলি খুশী হয়েই বেল্লিনিকে দিলেন। বেল্লিনি দেখলেন একটা সাধারণ তুলি। তিনি এই তুলিতে কীভাবে এমন রেখা আঁকেন সেটা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করাতে ডিউরর এঁকে দেখালেন কয়েকটা চুল।

ফোর এপোসলস (৪৮ ও ৪৯ নম্বর ছবি) ডিউররের একটা বিখ্যাত ছবি, একটা না বলে দুইটা বলা ভালো। আসলে দুইটা পাশাপাশি প্যানেলে চারটা ফিগার। এই ছবিটা ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইউরোপে রিফর্মেশন হচ্ছে। মার্টিন লুথারের প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন শুরু হয়েছে যার একটা অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে বাইবেল নিজে পড়তে হবে, চার্চের পড়ে দেয়া আর ব্যাখ্যা দেয়া বাইবেল পড়লে চলবেনা। মার্টিন লুথার বললেন, না চার্চ নয় মানুষ নিজেই নিজে বাইবেল পড়ে মুক্তির পথ খুঁজে নেবে, ঈশ্বরের বাণী সরাসরি নিজে দেখবে। এর পঞ্চাশ বছর আগেই গুটেনবার্গ প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার করেছেন। ছাপা হচ্ছে বাইবেল হাজার হাজার কপি। ডিউরর নিজেও ক্যাথলিক বিশ্বাস ছেড়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ছবি দুটোর সামনের দিকে লাল আর সাদা রৌব পরে আছেন প্রটেস্ট্যান্ট রিফর্মের দুইজন অন্যতম ধর্মনেতা সেইন্ট জন ও সেইন্ট পল। সেইন্ট জন লাল রৌবে প্রশান্ত মুখে বাইবেল পড়ছেন। আদতে তিনি তাঁর পিছনে থাকা সেইন্ট পিটারকে বাইবেল দেখাচ্ছেন। পিটারের হাতে স্বর্ণ চাবি, যা দিয়ে বাইবেলকে এতোদিন বদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই চাবিই ছিল ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যে ঢোকার চাবি। সেইন্ট পিটার ছিল ভ্যাটিক্যানের অফিসিয়াল মুখপাত্র। এই ছবিতে পিটারের হাতের চাবি অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, সমস্ত মনোযোগ বাইবেলের দিকে। পিটার যেন জনের আনুগত্য মেনে নিয়েছেন।

পরের ছবিতে সেইন্ট পল সামনে আর তাঁর পিছনে সেইন্ট মার্ক। সেইন্ট পল নিউ টেস্টামেন্ট লিখেছিলেন, তাঁর একহাতে নিউ টেস্টামেন্ট আরেক হাতে তরবারী। পলই বলেছিলেন ভালো কাজ নয় বিশ্বাসী মানুষেরাই স্বর্গে যাবে। সেইন্ট মার্ক যেন এক অনাগত ভয়ের দিকে আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছেন, আর সেইন্ট পল যেন দৃঢ় চিত্তে সেই ভবিষ্যৎ কে বরণ করে নিতে যাচ্ছেন। সেইন্ট পল শহীদ হন, তরবারি দিয়েই তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। এই সময়টা ছিল ভয়ানক, একে একে রাজ্যগুলো চার্চের অধীনতা থেকে মুক্ত হচ্ছে। বাইবেলের বহু পাঠের পরে, তৈরি হবে বাইবেলের নানা ব্যাখ্যা। তৈরি হবে খ্রিষ্ট ধর্মের নানা ফ্যাকড়া। সেই ফ্যাকড়ার বিবাদ মেটাতে ওয়েস্টফিলিয়ায় হবে ধর্মের সাথে ইউরোপের রাজনৈতিক ফয়সালা। তা হচ্ছে রাজাকে ধর্মের এই ফ্যাকড়া থেকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। শুরু হবে স্যেকুলারিজমের ইতিহাস আর স্যেকুলারিজমের নানা ফ্যাকড়ার ইতিহাস। যেই ইতিহাসের মধ্যে আমরা এখন বাস করছি।

https://nagorikpathagar.org

ইংলিশ ল্যান্ডস্কেপ

শিল্প বিপ্লবের সময়ে প্রকৃতি বলতে কী বুঝায় সেই অর্থের কী পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝতে কনস্টেবলের ল্যান্ডস্কেপ দেখা জরুরী। শিল্প বিপ্লব এসেছে নগরায়ন হচ্ছে, গ্রাম ছেড়ে নগরে আসছে হাজার হাজার মানুষ, গ্রামীন অর্থনীতির বদলে নগরকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে উঠছে। মর্ডানিজমের সংকটগুলো আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হচ্ছে। বাড়ছে বেকারত্ব, ক্ষুধা, বস্তি, সেই সময় কনস্টেবল এলেন ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে। এই গ্রামীণ ল্যান্ডস্কেপ যেন সেই হারানো স্বর্গীয় উদ্যান। ল্যান্ডস্কেপ তখনো গুরুত্বপূর্ণ পেইন্টিং হয়ে ওঠেনি। তখনো বিশাল ক্যানভাসে কেবলমাত্র ইতিহাসের ছবিগুলোই আঁকা হতো। কনস্টেবল আঁকলেন প্রকৃতির ছবি বিশাল ক্যানভাসে। কনস্টেবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি ল্যান্ডস্কেপ। ছবিটা কনস্টেবলের নিজের গ্রাম সাফোকের। গ্রামের ছবি দূরে দেখা যাচ্ছে চার্চের আবছা ছায়া। প্রকৃতি আছে মুখ গোমড়া করে, যেন এখুনি ঝড় আসবে। কনস্টেবল সিরিয়াসলি আবহাওয়া বিদ্যা পড়েছিলেন, প্রকৃতি কখন কেমন হয় সেটা জানার জন্য। বার্জগুলো অলস পরে আছে, কারণ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আসার পরে পণ্য পরিবহনের জন্য আর

ছবি নম্বর ৫১: ল্যান্ডস্কেপ - কনস্টেবল

https://nagorikpathagar.org

বার্জ লাগেনা। একজন বালক দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়,বার্জগুলোর পিছনে ছবির ঠিক মাঝখানে; সেটাই কনস্টেবলের শৈশব। নস্টালজিয়ায় ভুগছে কনস্টেবল, খুঁজে ফিরছে তাঁর হারানো শৈশব, তাঁর গ্রামে যা তাঁর কাছে স্বর্গীয়, অনেকটাই গার্ডেন অব এডেনের মতো যেখান থেকে সে শিল্প বিপ্লবের কারণে বিতাড়িত হয়েছে। চার্চটার উপস্থিতি খুব পোয়েটিক বা কাব্যিক। শিল্প বিপ্লব তো শুধু অমৃতের পুত্র কন্যাদেরকেই স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত করেনি, চার্চকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

কনস্টেবলের তুলির কাজগুলো লক্ষ্য করুন, আলো ছায়া, পানিতে প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করুন। তাঁর হাত ধরেই এক নতুন চিত্ররীতির আগমন ঘটবে যার নাম ইম্প্রেশনিজম। কনস্টেবল আরো একটা টেকনিক আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে সবুজের মধ্যে ফুটকি ফুটকি দিয়ে হলুদ আর নীল রঙ দিলে সবুজ আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার সবুজের নানা শেইড আনা যায়।

আর ঝড়? কনস্টেবল কি বুঝতে পেরেছিলেন মডার্নিজম ঝড় হয়েই আছড়ে পড়বে পৃথিবীর উপর?

মডার্নিজমের ক্রিটিকে টার্নার

ছবি নম্বর ৫২: স্লেইভ শিপ - টার্নার

https://nagorikpathagar.org

ইংলিশ পেইন্টার টার্নার ছিলেন প্রকৃতি বিশেষ করে সমুদ্রের পেইন্টিং এর গুরু। তার মতো মোহনীয় করে সমুদ্র আর সূর্য আর কেউ এখনো পর্যন্ত আঁকতে পেরেছে কিনা আমার জানা নেই। সমুদ্রকে এতো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে একবার তিনি সমুদ্র ঝড় দেখবেন বলে স্থির করলেন। তিনি ঝড়ের আগে নিজেকে মাস্তুলের সাথে বেধে নিয়ে জাহাজ ছাড়লেন।

টার্নারের একটা পেইন্টিং আছে নাম *Rain, Steam and Speed*; এই ছবিতে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটা বাষ্পীয় ট্রেন এগিয়ে আসছে, ছবিতেই মনে হচ্ছে দুরন্ত গতিতে বৃষ্টি আর বাষ্প কেটে আসছে ট্রেন। দেখা যাচ্ছে শুধু ট্রেনের কালো ইঞ্জিনের আবছায়া অবয়ব।

আজকে যেই ছবিটার কথা বলবো সেটা অবশ্য ট্রেনের ছবি নয়। এটা আরেকটা ছবি, নাম স্লেইভ শিপ। এটাও সমানভাবে বিখ্যাত। ছবিটার পুরো নাম *Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On*; ছবিতে দেখা যাচ্ছে টাইফুন আসছে, সূর্য ডুবছে। এই সূর্য ডোবার মুহূর্তের পেইন্টিং এর ধরণ টার্নারের নিজস্ব। সূর্যকে তিনি কোন কিছুর পশ্চাৎপটে রেখে আঁকতেন, এতে সূর্য অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতো। ছবির উজ্জ্বল পটভূমি ছেড়ে ডাইনে নিচে দেখুন, উত্তাল তরঙ্গে ভাসছে শেকলে বাঁধা মানুষের পা। তখন মনে হয় এটা শুধুমাত্র সূর্যাস্ত নয়, ঝড় নয়, সমুদ্র নয়, জাহাজ নয়, আলোছায়ার খেলা নয়, আরো গভীর কিছু যা দর্শককে এক ভয়ানক বাস্তবতার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই ছবিই যেন শিল্প বিপ্লব আর মডার্নিজমের প্রতিচ্ছবি, চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তার রঙ এর প্রাচুর্য দিয়ে কিন্তু ঔজ্জ্বল্য চোখে সয়ে গেলেই নির্মম বাস্তবতা মুখ দেখায়। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা জাহাজ যা দাস বহন করছে, টাইফুন আসছে, ক্যাপ্টেইন আদেশ দিয়েছে শেকলবদ্ধ দাসদের জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়ার। কারণ দাসেরা অসুস্থ হয়ে মারা পড়লে বীমার টাকা পাওয়া যায়না, তাই দেখাতে হবে যে ঝড়ে তাঁদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে। জাহাজ থেকে ছুড়ে দেয়া দেহগুলোই ডাইনে নিচে এসে জমা হয়েছে। প্রকৃতির রুদ্র রূপ আর মানুষের বীভৎস নিষ্ঠুরতা এই ছবিতে একাকার। টাইফুন যেন ঐশ্বরিক প্রতিশোধ, যা ডুবিয়ে দেবে নির্মম জাহাজ আর তার ক্যাপ্টেইনকে। কিন্তু ডুববে তো দাসেরাও, হ্যাঁ ডুববে, কারণ প্রকৃতি পক্ষপাতহীন। ছবির বা দিকে সাদা, নীল আর সবুজের একটা ঠাণ্ডা আবহ, যা জাহাজটিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে; এই চিত্রকল্প মৃত্যুর, যা রক্তের লাল রঙা মাস্তুলের জাহাজের পাপকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাস করবে।

নির্মম বর্বরতার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা মর্ডানিজম তার হাতের রক্তের দাগ মুছে ফেলেছে পরের শতাব্দীগুলোতে, নির্মম মর্ডানিজম তাই আজ আমাদের মুগ্ধতা জাগায়।

কিন্তু টার্নারের মত মহৎ শিল্পীদের সৃষ্টি যতদিন থাকবে ততদিন এই নির্মমতার ইতিহাস আমরা ভুলে যাবোনা।

গরীবের শিল্পী দ্যমিয়ে

আমরা শুনে থাকি বহুমূল্যে ছবি বিক্রির গল্প। কিছু পেইন্টারের ফ্যাবুলাস জীবনের কথা। কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ মহৎ শিল্পীর জীবন কেটেছে দারিদ্রে, অল্প কিছু শিল্পীর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্রে। আমাদের

https://nagorikpathagar.org

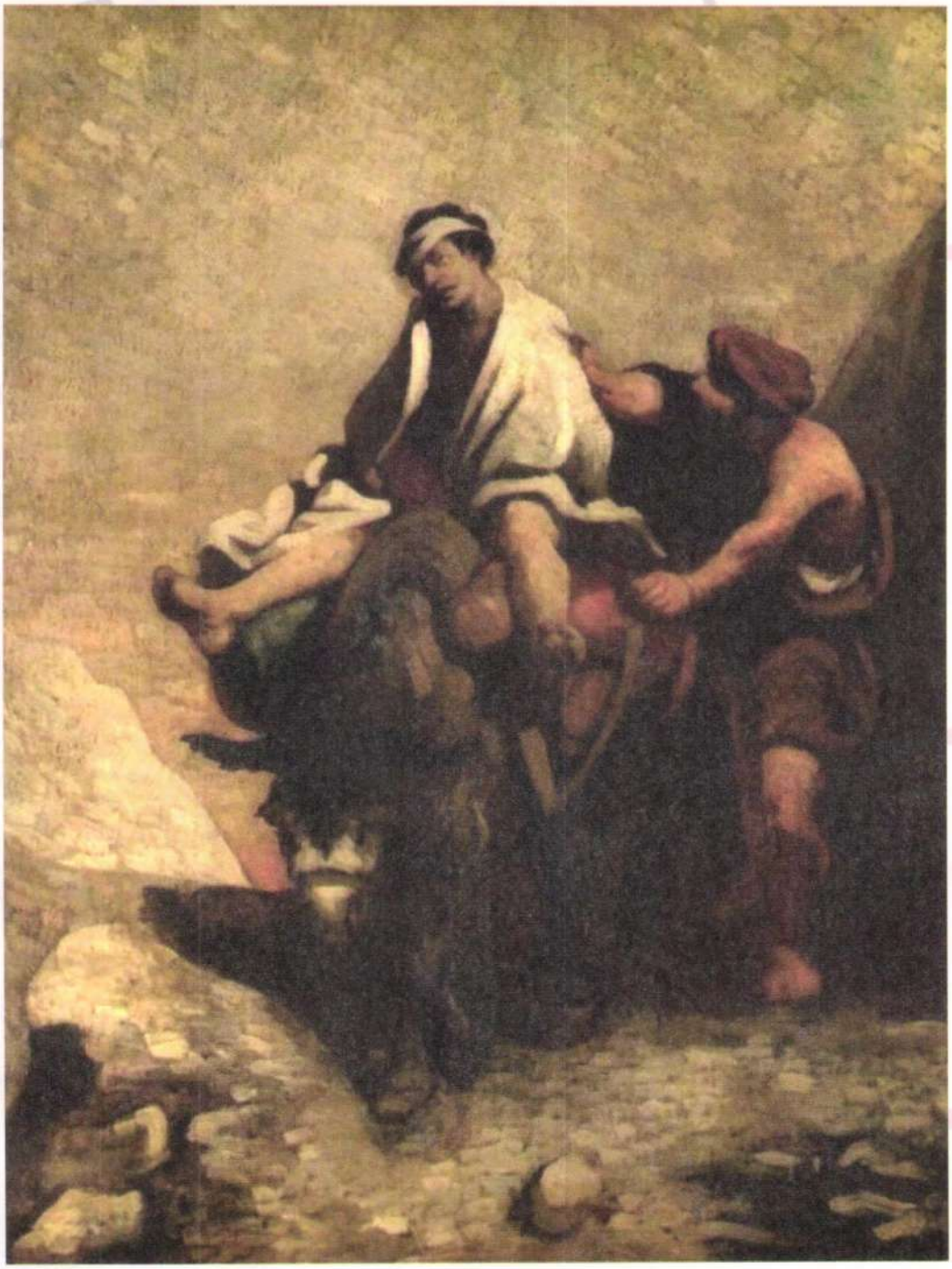

ছবি নম্বর ৫৩: দ্য গুড সামারটিয়ান - দ্যমিয়ে

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৫৪: দ্য গুড সামারটিয়ান- ভ্যান গগ

https://nagorikpathagar.org

জয়নুল দরিদ্রদের নিয়ে ছবি এঁকেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের আগে ইউরোপে দরিদ্রদের জীবন আর তাদের লড়াই নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পেইন্টিং আঁকা হয়নি। দ্যমিয়ে ছিলেন এমন একজন, যিনি দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন, এই জীবনকেই আঁকতে চেয়েছেন তাঁর ক্যানভাসে। কার্টুন, লিথোগ্রাফ আর পেইন্টিং সবগুলোতেই সমান দক্ষ ছিলেন।

দ্যমিয়ে খুব দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন, বাবা জানালার শার্সি লাগাতেন। দ্যমিয়ে ছিলেন আমাদের আধুনিক কার্টুনিস্টদের পূর্বসূরি। ক্যারিক্যাটিওর বলে একটা পত্রিকায় তিনি একুশ বছর বয়সে কার্টুন আঁকতে শুরু করেন। তাঁর কার্টুনের বিষয় ছিল গরীবের উপর জুলুম আর শোষণ। রাজা লুই ফিলিপকে নিয়ে একটা কার্টুন এঁকেছিলেন, যে রাজা ফিলিপ গরীব লোকদের কাছে থেকে কেড়ে নেয়া সম্পদের বড় বড় থলি গপগপ করে গিলে খাচ্ছেন। ব্যাস আর যায় কোথায় দ্যমিয়ে সোজা জেলে। বালজাক বলেছিলেন দ্যমিয়ের মধ্যে মিকেলেঞ্জেলোর গুণ আছে।

দ্যমিয়ে তেল রঙে আঁকতে শুরু করেন চল্লিশ বছর বয়সে। ছবি আঁকলেন একটা "দ্য গুড সামারটিয়ান" (৫৩ নম্বর ছবি)। কিন্তু ছবিটার কোন প্রশংসা হলনা। এই ছবির পিছনে একটা গল্প আছে। গল্পটা বাইবেলের। যীশু তাঁর অনুসারীদের সামনে গল্প করছেন, যে একজন আহত, শতচ্ছিন্ন পোশাকে এক মানুষ পথের ধারে পরে আছে। একজন পুরোহিত পাশ দিয়ে হেঁটে গেল তাঁকে সাহায্য করলোনা, একজন ইহুদী হেঁটে গেল সেও সাহায্য করলোনা, কিন্তু একজন সামারটিয়ান পাস দিয়ে যাবার সময় সে আহত মানুষকে শুশ্রূষা করে তাঁর গাধার পিঠে

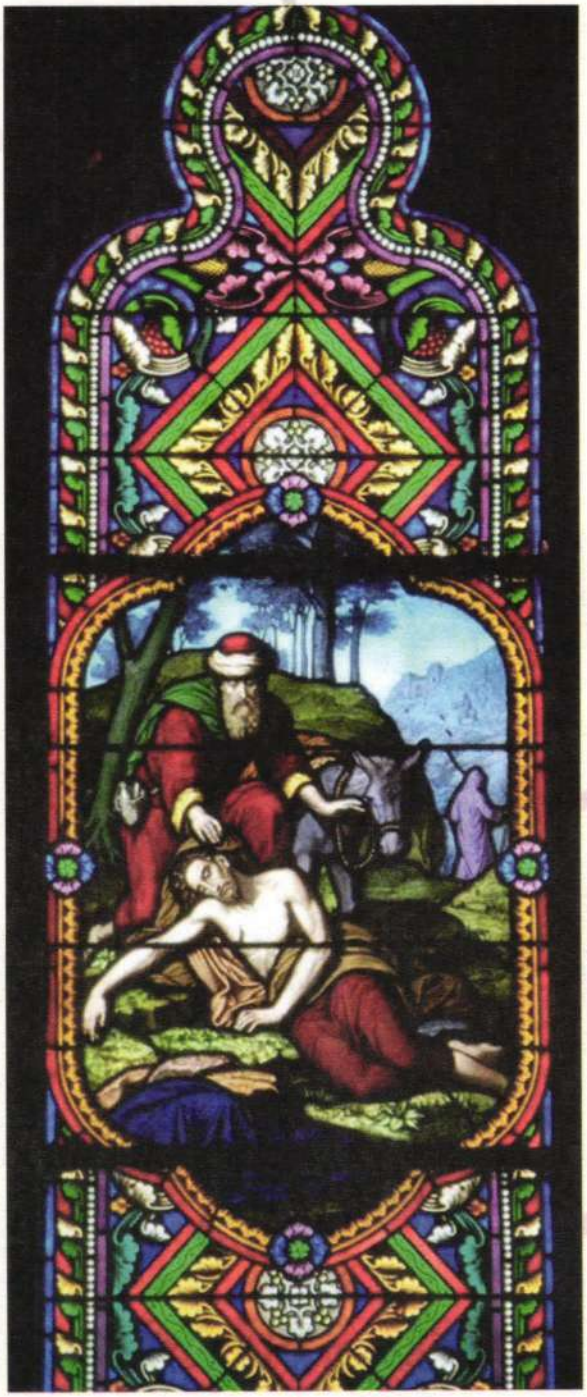

ছবি নম্বর ৫৫: প্যারাবল অফ গুড সামারটিয়ান

https://nagorikpathagar.org

তুলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিল। এই সামারটিয়ান এক সম্প্রদায় ছিল, যাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বর্ণবাদী ঘৃণা প্রচারের ইতিহাস ছিল। খেয়াল করলে দেখবেন যীশু বর্ণবাদী ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে একটা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড নিচ্ছেন, এমন সময়ে যখন তাঁর ধর্ম প্রচার চলছে ইহুদীদের মধ্যে।

দ্যমিয়ের এই ছবিটার উপরে অন্য কেউ পরে মাতব্বরি করে ব্রাশ টেনেছে, তাই ছবিটা ঠিক আদতে কেমন ছিল বুঝা সম্ভব নয়। এই ঘটনা নিয়ে আরো অনেকেই ছবি এঁকেছেন এমনকি ভ্যান গগও এঁকেছেন (৫৪ নম্বর ছবি)। এই ঘটনা বাইবেলের একটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প তাই চার্চের প্রার্থনা করার জায়গায় এই গল্পের ছবি দিয়ে গ্লাস ওয়ার্ক বা পেইন্টিং নানা কাজ করা থাকে (৫৫ নম্বর ছবি)। সামারটিয়ান নামে পশ্চিমে যত হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হসপিস দেখেন সব এই গল্প থেকে উৎসরিত।

তেলরঙ বিক্রি না হওয়ায় দ্যমিয়ে আবার লিথোগ্রাফে মন দেন, মনে আশা লিথোগ্রাফে কিছু টাকা কামিয়ে আবারো তেলরঙ আঁকবেন। কিন্তু টাকা জমাতে পারলেন না। চিলে কোঠায় অন্ধকারে ছবি আঁকতেন, অল্প

ছবি নম্বর ৫৬: থার্ড ক্লাস ক্যারিজ - দ্যমিয়ে

https://nagorikpathagar.org

আলোয় চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দ্যমিয়ের বন্ধুরা অনেক দামে ছবি বিক্রি করতেন। দ্যমিয়ে বলতেন, "টাকা না হোক, আমার আছে জনগণ।" প্যারিসের সাধারণ মানুষ তাঁর ছবি দেখার জন্য পাগল হয়ে যেত। কিন্তু এই সাধারণ মানুষের হাতে তো টাকা নেই।

তাঁর একটা বিখ্যাত ছবি থার্ড ক্লাস ক্যারিজ। ছবিটা শেষ করে যেতে পারেন নি দ্যমিয়ে, কিন্তু চিত্রকলার ইতিহাসে এক অসামান্য স্থান দখল করে আছে ছবিটি (৫৬ নম্বর ছবি)। একটা তৃতীয় শ্রেণীর রেলের কামরায় একটা পরিবার। তাদের পোশাক, বসার ভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে তাদের জীবন যন্ত্রণা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁরা নীরবে বসে আছে, কিন্তু যেই দুর্বহ জীবন তাদের বহন করতে হচ্ছে তাঁর ভার দর্শককে স্পর্শ করে। নৈঃশব্দের ভিতর দিয়ে উচ্চকিত প্রকাশ। ছবির ফিগারগুলো নিঃশব্দ, কারণ ছবির জগত ও তাঁদের নিয়ে কোনদিন কিছু বলেনি।

শেষ বয়সটা খুব কষ্টে কেটেছে দ্যমিয়ের, তাঁকে ফ্রান্সের সেরা সম্মান লিজিওন অব অনার দেয়া হয়, দ্যমিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৭৮ সালে ভিক্টর হুগো দ্যমিয়ের একটা প্রদর্শনী করেন, খরচ ওঠেনা প্রদর্শনীর। এর ঠিক এক বছর পরেই দ্যমিয়ে মারা যান। যখন মারা যান তখন তিনি অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও একা। এমনকি কবর দেয়ারও পয়সা তিনি রেখে যাননি। যেই মজলুম নিপীড়িতদের তিনি ভালবেসেছিলেন ঠিক তাঁদের জীবন যাপন করেই মহাকাব্যিক বিদায় নিলেন দ্যমিয়ে। হয়তো আজকেও অসংখ্য দ্যমিয়ে যা সৃষ্টি করতে পারতো; দারিদ্র্যের কষাঘাতে তা পারছেননা, হয়তো মহাকালের কোন লেখক আজকের মতই তাঁদের স্মরণ করে তাঁদের কাউকে কাউকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বেদনার্ত হবে।

ইম্প্রেশনিজম

ফ্রান্সে স্যাঁলো বলে সরকারী একটা ব্যবস্থা ছিল যেখানে পেইন্টিং বিক্রি হতো। জুরীরা সেখানে ছবি নির্বাচন করতেন, কার ছবি স্যাঁলোতে যাবে আর কারটা যাবেনা। জুরীরা অনেক গুণী শিল্পীর ছবি স্যাঁলোতে প্রদর্শনের আবেদন বাতিল করেছিলেন। আমরা আজ যাদের নাম জানি ইম্প্রেশনিস্ট বলে যেমন ক্লদ মনে, রেনোয়া, এদগার দেগা, মানে, ব্যাকথো মহিজো, আলফ্রেদ সিস্লি এদের সবার ছবিই স্যাঁলোর জুরীরা বাতিল করেছিল। স্যাঁলোতে প্রদর্শিত না হলে তো ছবি বিক্রি হবেনা। তাই তাঁরা একসাথে হয়ে চাঁদা তুলে একটা প্রাইভেট স্টুডিও ভাড়া করলো। সেখানেই নিজেদের ছবি প্রদর্শন করলো। খুব একটা সমাদর পেলো না ছবিগুলো। দর্শকেরা বললেন, ধুর কী এঁকেছে ফিনিশিং টাচই তো দেয়নি। এটা তো পেইন্টিং না পেইন্টিং এর ইম্প্রেশন। ইম্প্রেশন শব্দটা তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হলেও এটাই এই নতুন চিত্রধারার নাম হয়ে যায়।

তাঁরা আঁকলেন ল্যান্ডস্কেপ, কোন এক বিশেষ মুহূর্ত, আলো ছায়া, গতি। ক্লদ মনে সকাল বেলায় একগাড়ি সাদা ক্যানভাস নিয়ে যেতেন ছবি আঁকতে আর সারাদিন একই বিষয়ের ছবি আঁকতেন একটার পরে একটা, একেক সময়ে একই বিষয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোর প্রভাবে কেমন রূপ ধারণ করে সেটা আঁকলেন। একই বিষয়ের নানা সময়ের ছবি এভাবে আগে কেউ আঁকেননি। ইম্প্রেশনিস্টরা স্টুডিওতে ছবি আঁকার চাইতে মুক্ত আকাশের নিচে ছবি আঁকতেই পছন্দ করতেন। লোকে তাঁদের বলতো "মুক্ত হাওয়ায় শিল্পী"।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৫৭: চীনের পাহাড়ের ছবিতে দুরত্ব আর কুয়াশার ছায়া

ক্লদ মনে একই খড়ের গাদার পনোরোটা ছবি আঁকেন, পনোরোটাই আলাদা সময়ের, আলাদা আলোর কাজ। ইম্প্রেশনিস্টরা এদুয়ার মানেকে তাঁদের গুরু মানতেন। মানেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইম্প্রেশনিজমে সর্বপ্রধান লোক কে? মানে উত্তর দিয়েছিলেন "আলো"।

ছবি নম্বর ৫৮: সাওয়ার বিলো দা সামিট (Sanka hakuu) - কাতসুশিকা

তবে ইম্প্রেশনিজমে যে আলোর খেলা তার আবিষ্কার কিন্তু ইউরোপে হয়নি হয়েছে চীন আর জাপানে চীনের পাহাড়ের ছবিতে দুরত্ব আর কুয়াশার ছায়া (৫৭ নম্বর ছবি) আর জাপানের উড ব্লক ছবিতে (৫৮ নম্বর ছবি) প্রকৃতি দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল

https://nagorikpathagar.org

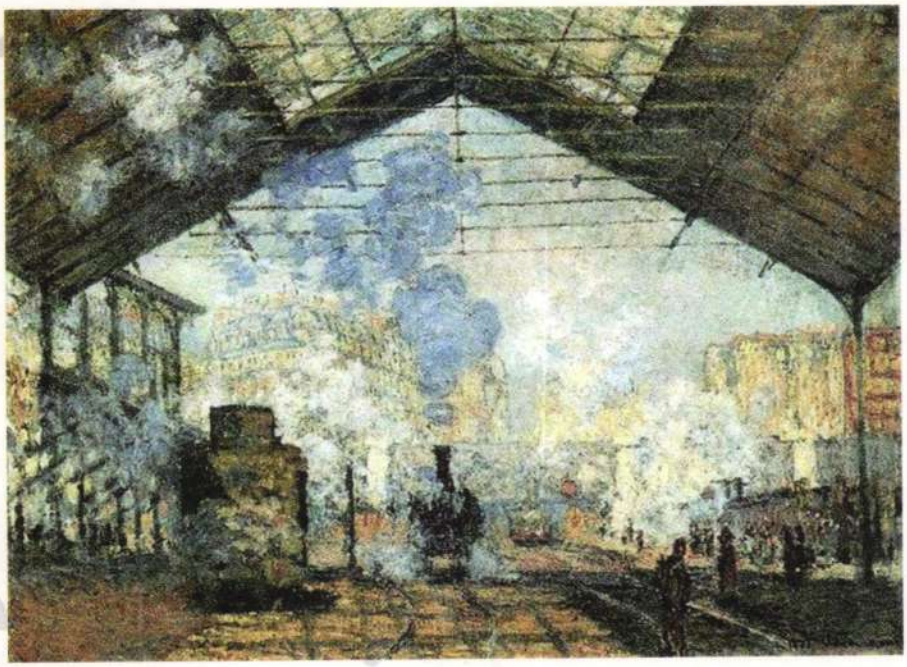

ছবি নম্বর ৫৯: গ্যার স্যা ল্যাজা - ক্লদ মনে

ছবি নম্বর ৬০: ক্লিফ ওয়াক এট পুহোভিল্লে - ক্লদ মনে

https://nagorikpathagar.org

ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টারদের। সেই সময়েই ইউরোপের সাথে জাপান আর চিনের বাণিজ্য শুরু হয়েছিল।

ইম্প্রেশনিস্ট ছবির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ক্লদ মনের একটা বিখ্যাত ছবি দিয়ে। গ্যার স্যা ল্যাজা মানে হচ্ছে স্যা লাজা নামের একটা জংশনের ছবি। ট্রেন ঢুকছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করে বাষ্প ছাড়ছে। বাষ্পে পশ্চাৎপট অস্পষ্ট। আপনার মনে হবে কিছুই তো ঠিকমতো আঁকেননি শিল্পী। আমি বলবো, দেখুন একবার আর বলুন কী মনে হচ্ছে। আপনি বলবেন হয়তো শুধু বাষ্পের ধোঁয়া আর কিছুনা। হ্যাঁ শিল্পীও আপনাকে বাষ্পের ধোঁয়াই দেখাতে চেয়েছে আর কিছুনা।

ইম্প্রেশনিজম; ক্লদ মনে

ক্লদ মনে ইম্প্রেশনিজমের একজন প্রধান পেইন্টার। তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত ছবির সিরিজ ওয়াটার লিলি সিরিজ। জিভার্নিতে তাঁর বাসায় একটা পদ্ম পুকুর ছিল। সেই পদ্ম পুকুরের ছবি নিয়ে তিনি বিশাল এক সিরিজ করেন। ছবিগুলোর দৈর্ঘ্যও বিশাল বিশাল। শুধু পুকুর, সেখানে মেঘের ছায়া, পদ্ম, পদ্ম পাতা, শ্যাওলা, আলো ছায়া এই দিয়ে যে কী মহৎ শিল্প রচনা করা যায় এই সিরিজ তাঁর প্রমাণ।

তবে এখন আমি আলাপ করবো মনের আরেকটা ছবি নিয়ে, ক্লিফ ওয়াক এট পুহোভিল্লে (৬০ নম্বর ছবি)। দুইজন নারী আয়েশী ছন্দে সমুদ্রের পাড়ে একটা ক্লিফে হাঁটছেন। ছবিটা ইংলিশ চ্যানেলের নরম্যান্ডির উপকূলে। চারিদিকে তুমুল বাতাস, বাতাসে শুধু পোশাকই উড়ছে না, বাতাসে ক্লিফের ঘাস, লতা দুলছে, নিচে সমুদ্রে একই বাতাস ঢেউ তুলছে। ছবিটা দেখলে মনে হয় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সমুদ্রে বেশ কিছু নৌযান, দেখে মনে হয় অবকাশ যাপনের সামুদ্রিক বোট।

ছবি নম্বর ৬১: ক্লদ মনে যে ক্লিফ এঁকেছিলেন সেই ক্লিফটা অফিসে দেখতে যেমন

সমস্ত ক্যানভাসে একটা অবকাশের আমেজ। শিল্প বিপ্লবের ফলে জন্ম হয়েছে একটা

https://nagorikpathagar.org

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যাদের এখন অবকাশের সময় হয়েছে। ট্যুরিজম নামে একটা ধারণা জন্ম নিচ্ছে।

মনের ক্যানভাস খুব কাছে থেকে দেখতে হয়, বইয়ের ছাপা এই ছবিতে অবশ্য সেই সুযোগ নেই, মনে কাঁচা রঙের উপর আরেক পরত কাঁচা রং লাগাতেন, তখন দুই রঙের কিছু অংশ একটা জায়গায় মিলে গিয়ে নিচের কিছু রং উপরে উঠে আসতো। কাঁচা রঙের উপর আবার আর এক পোঁচ কাঁচা রং লাগানোর এই সফল পরীক্ষা ক্লদ মনেই সম্ভবত প্রথম করেন। ছোট ছোট ব্রাশ স্ট্রোকে আঁকা ছবিতে, বিশেষ করে ফিগার গুলোতে ফিনিশিং টাচ নেই, কিন্তু পোষাকে বাতাসের ইফেক্ট দুর্দান্ত।

পুহোভিল্লের ক্লিফ আর সমুদ্র নিয়ে মনে বেশ কয়েকটা ছবি এঁকেছেন। পুহোভিল্লে এখনো একটা দারুণ টুরিস্ট লোকেশন। সেই ক্লিফগুলোতে আজকে গিয়েও খুঁজে নিতে পারবেন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে মনে এই ভিউটি এঁকেছিলেন। পুহোভিল্লের আজকের ছবি ৬১ নম্বর ছবিটা।

ইমপ্রেশনিজম এদগার দেগা

দেগা ছবিতে আঁকলেন অতর্কিত মুহূর্ত। যেই সময়টাতে সাবজেক্ট মনে করছে কেউ তাঁকে দেখছেনা, ঠিক সেই সময়ে কেউ যেন দৃশ্যটা উঁকি দিয়ে দেখছে, এমন মুহূর্তগুলোকে দেগা আঁকতেন দারুণ মুনশিয়ানার সাথে। এইসব দেখাকে দেগা বলতেন "ঘরের দরজায় তালার ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঘর দেখা"। এইসময়ে মানুষের যেমন একান্ত কিছু ভঙ্গি থাকবে, একান্তে চলাফেরা করবে সেই ভঙ্গি আর চলাফেরা ধরা পড়তো দেগার ছবিতে। যেমন তিনি আঁকতেন নাচিয়ে ব্যালেরিনাদের ব্যাক স্টেজের ছবি, প্র্যাকটিসের ছবি, মেয়েরা গা ধুচ্ছে, মহিলা ইস্ত্রি করছে, জকীরা রেসের মাঠে ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে। তবে দেগার বেশিরভাগ ছবিই ব্যালেরিনাদের নিয়ে। দেগার কিছু ভাস্কর্য ও আছে সেগুলোও সেই ব্যালেরিনাদের নিয়েই। ব্যালেরিনাদের নিয়ে আর কেউ এককভাবে এতো কাজ করেনি।

দেগা আঁকতেন মূলত প্যাস্টেল রঙে, মানে শুকনো রঙে তাই তেল রঙের মতো উজ্জ্বল হতোনা ছবিগুলো তবে রঙ প্রথমে যেমন ছিল তেমনই থাকে দীর্ঘদিন।

দেগার এই ছবিটার নাম ব্যালে ক্লাস। ছবিটা ক্লাস শেষ হবার ঠিক পরের সময়। ছবির মাঝখানে একটা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যালে শিক্ষক জুলে পেহো। পেহো ছিলেন দেগার বন্ধু। তিনি সহৃদয় হয়ে দেগাকে ছবি আঁকার জন্য তার ক্লাসে ঢুকতে দিতেন। দেগার আরো অনেক ছবিতে এই ভদ্রলোককে লাঠি হাতে দেখতে পারবেন।

ঠিক সামনেই এক ব্যালেরিনা কোমরের নিচে ঢেউ খেলানো টুটু ঠিক করে নিচ্ছেন। ঠিক তার পিছনে একজন ব্যালেরিনা আনমনে নখ কামড়াচ্ছে, পিছনে ডান দিকে আরেক ব্যালেরিনা উল্টোদিকে ঘুরে বুকের কাপড় ঠিক করে নিচ্ছে। নারীদের সকল একান্ত অসচেতন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। দেয়ালে একটা আয়না। ব্যালে ক্লাসে নিজের ভঙ্গি দেখার জন্য আয়না প্রয়োজন। একদম পিছনে কয়েকজন বয়স্কা মহিলা। তাঁরা ব্যালেরিনাদের মা, মেয়েদের সাথে এসেছেন।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৬২: লিটিল ড্যান্সার অফ ফরটিন ইয়ার্স - এদগার দেগার ভাস্কর্য

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৬৩: ব্যালে ক্লাস- এদগার দেগা

দেগার পেইন্টিং এ নারীদের মুখ সুন্দর হতোনা। তিনি ভাবতেন সুন্দর মুখশ্রী আঁকলে ছবির গুনাগুনের দিকে দর্শক নজর দেবেনা।

এই ছবিটা একটা বিশেষ মুহূর্তের কিন্তু এই মুহূর্তটা ধরতে, মানে এই ছবিটা শেষ করতে দেগা তিন বছর সময় নিয়েছিলেন। খুব ধীরে ছবি আঁকতেন দেগা। আরেকজন সমসাময়িক পেইন্টার খুব ধীরে আঁকতেন তিনি হচ্ছেন সেজান।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৬৪: লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি - রেনোয়া

ছবি নম্বর ৬৫: লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি - রেনোয়া

ইমপ্রেশনিস্ট রেনোয়া

রেনোয়ার এই ছবিটা যখন আঁকা হয় ততদিনে প্রথম ইম্প্রেশনিজমের এক্সিবিশনের পরে সাত আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রেনোয়ার ছবিতে এসেছে নাগরিক জীবন, তার উচ্ছলতা। শিল্পবিপ্লবের পরে যে নতুন অভিজাত আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল সেই জীবনের প্রতিবিম্ব আঁকতেন রেনোয়া। উজ্জ্বল রঙ আর

https://nagorikpathagar.org

দুর্দান্ত কম্পোজিশনের কারণে রেনোয়ার ছবি সবসময়েই দৃষ্টিনন্দন। রেনোয়া দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে রিউমাটয়েড আর্থাইটিসে ভুগে হাতের আঙুলগুলো বেঁকে ডিফর্মড হয়ে গিয়েছিল। তিনি তুলি ধরতে পারতেন না। তুলি তার হাতে সুতো দিয়ে বেধে নিয়ে তারপরেও তিনি ছবি আঁকা চালিয়ে গেছেন।

রেনোয়ার এই ছবিটা লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে। এটা রেনোয়ার অন্যতম প্রধান ছবি। এই ছবির সব চরিত্রই রেনোয়ার পরিচিত আর বন্ধুবান্ধব। একই রকম আরেকটা ছবি আছে রেনোয়ার মুলান দো লা গ্যালেত, নাগরিক অবসর আর আনন্দের ছবি। মুলান দো লা গ্যালেতের সাথে এই ছবির একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, মুলান দ্য গ্যালোতের ফিগারের বাক বা কন্টুরগুলো আবছা ব্রাশ ওয়ার্ক দিয়ে করা

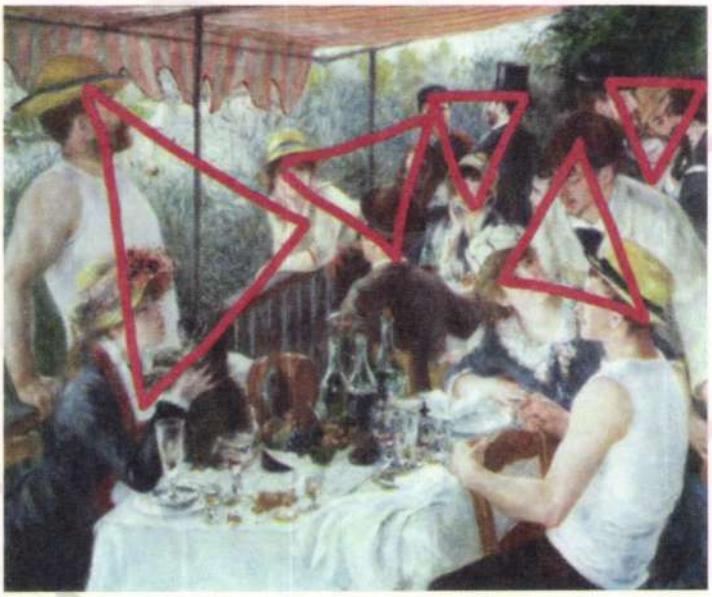

ছবি নম্বর ৬৬: লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি - রেনোয়া

ছবি নম্বর ৬৭: লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি - রেনোয়া

https://nagorikpathagar.org

ফলে সেই ফিগারের থ্রি ডাইমেনশন্যাল ভাবটা আসেনি। আর বৌটিং পার্টির ছবিগুলোর ফিগারগুলো থ্রি ডাইমেনশন্যাল। ফিগারের মুখগুলো খুব যত্ন করে আঁকা হয়েছে। বৌটিং পার্টির এই ছবির কুশীলবেরা এসেছে প্যারির এক শহরতলীতে যেখানে নদীর উপরে একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে, সেই রেস্টুরেন্টে নৌকা নিয়ে যেতে হয়। ছবির বামদিকের উন্মুক্ত বাহু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ ফিগারটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের মালিকের ছেলে। আর ডান দিকে আরেক উন্মুক্ত বাহু নিয়ে বসে থাকা ফিগারটা ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টার ক্যালিব্যাট। এই দুই সাদা পোশাকের ফিগার আসলে এই ছবির কম্পোজিশনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই ফিগারগুলোই এই কম্পোজিশনের দুই পিলার, ঠিক যেন একটা কোটেশন মার্ক (৬৫ নম্বর ছবি দেখুন)। দুইজন ঠিক বিপরীত দিকে ঝুঁকে যেন ব্যাল্যান্স করছে। এই ছবির আরেক কম্পোজিশন হচ্ছে ফিগারগুলো। ফিগারগুলো ট্র্যাঙ্গুলার বা ত্রিভুজাকৃতিতে দাঁড়িয়ে আছে। এমন পাঁচটা ট্র্যাঙ্গুলার ফর্ম আছে এই ছবিতে (৬৬ নম্বর ছবি দেখুন)। ছবির কম্পোজিশনে রেনেসাঁ পেইন্টিং এর আগের পিরামিডের কম্পোজিশন আবার ফিরিয়ে এনেছেন রেনোয়া (৬৭ নম্বর ছবি দেখুন)।

ছবির সামনে কুকুরকে আদর করা মহিলা রেনোয়ার গার্লফ্রেন্ড আলেন শার্গো; আলেনকেই রেনোয়া পরে বিয়ে করেন। রেলিং এ হেলান দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা মহিলা রেস্টুরেন্টের মালিকের মেয়ে। সবাই উত্তম পানীয়ের সাথে উত্তম খাদ্য আর ধূমপানে মত্ত। ফিগারগুলো একে অন্যের দিকে ঝুঁকে আছে। সামনে ঝুঁকে থাকা আর পিছনে হেলে থাকা ফিগারগুলো যেন ওজনের ব্যালান্স আর কাউন্টার ব্যালেন্স করছে। কিন্তু যে যার দিকে ঝুঁকেছে সে তার দিকে পাল্টা তাকিয়ে নেই। যেমন ক্যালিবাতের সামনে বসা মহিলার মুখের উপর যে স্ট্রাইপ জ্যাকেট পরা পুরুষ ঝুঁকে দাড়িয়ে আছে সেই মহিলা কিন্তু ঝুঁকে থাকা পুরুষকে দেখছে না, সেই মহিলা তাকিয়ে আছে ক্যালিবাতের দিকে। নতুন শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষে মানুষে নতুন জটিল সম্পর্ক বিন্যাসকে যেন মূর্ত করেছে ছবিটা।

এই ছবির রঙের ব্যবহার দুর্দান্ত, বিশেষ করে কমলা রঙের ব্যবহার। দুইজন মহিলার জামার রিবনে আর টুপির ফুলে অল্প কমলার ছোয়া, পুরো ছবিটাকেই যেন বিপুল ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল করে দিয়েছে।

এই ছবিটা এতো জীবন্ত যেন, আপনি গ্লাসের টুংটাং শব্দ শুনতে পাবেন, হাসির শব্দ শুনতে পাবেন, শুনতে পাবেন বাতাসের শব্দ। গ্লাসগুলোকে আঁকা হয়েছে শুধু লাইট আর শ্যাডো দিয়ে। বাইরের দৃশ্য যা দেখা যাচ্ছে তা একটা লাইট স্কেচ। রেলিং এ হেলান দেয়া নারীর শরীরেই শুধু সরাসরি সূর্যের আলো পড়েছে। বাকি সবার শরীরে আলো এসেছে মাথার উপরের আচ্ছাদন ভেদ করে, ফলে নীল আর গোলাপি রঙের প্রাধান্য সব ফিগারে। রেনোয়া যেন এক নতুন যুগের ইউটোপিয়া তৈরি করেছেন। যেই ইউটোপিয়ার স্রষ্টা ফরাসী বুর্জোয়ারা।

রেনোয়া মনে করতেন পৃথিবীতে দুঃখের অনেক ঘটনা এমনিতেই আছে, ফলে সে ক্যানভাসে ঐ সমস্ত দুঃখজনক ঘটনার অবতারনা করে দুঃখের সংখ্যা বাড়াতে চাইতো না। পেইন্টিং তার কাছে আনন্দের উপলক্ষ; ফলে সুখ ও আনন্দ বিষয়েরই ছবি রেনোয়া এঁকে গেছেন সবসময়। আর তাঁর আনন্দ ও সুখের বিষয় অতিঅবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর আনন্দ দৃশ্য ও উমেন নুড।

আর শেষতক রেনোয়া ইম্প্রেশনিস্ট শৈলীর সমালোচনাও করেছিলেন এই বলে যে; এই শৈলী বস্তুর

https://nagorikpathagar.org

গড়ন তৈরিতে ব্যর্থ। ফলে রেনোয়া শেষ জীবনে ক্ল্যাসিকাল চিত্রের গড়নের আদলে ইম্প্রেশনিস্ট রঙের প্রবণতাসহ ছবি এঁকেছেন।

পোস্ট ইম্প্রেশনিজম সেজান

সেজান ছিলেন দেগা, রেনোয়া, ক্লদ মনে আর এদুয়ার মানের বন্ধু। উপন্যাসিক এমিল জোলাও ছিলেন সেজানের বাল্যবন্ধু। পেইন্টিং শুরুও করেছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট হিসেবেই। ১৮৩৪ সালে যে প্রথম ইম্প্রেশনিস্ট প্রদর্শনী হল সেখানে ছিলেন সেজান। সেই প্রদর্শনীতে নাকি সবচেয়ে বেশী গালাগাল খেয়েছিলেন সেজান। তাঁকে বলা হয়েছিল আহাম্মক, গাধার গাধা আর সেই গাধা লেজ দিয়ে নাকি ছবি এঁকেছে। সেজান রাগে

ছবি নম্বর ৬৮: সেজান এমিল জোলাকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনাচ্ছেন পল সেজান

https://nagorikpathagar.org

দুঃখে প্যারি ছেড়ে চলেই গেলেন আর ফেরেননি। এই সময় জোলা একটা উপন্যাস লেখেন যার চরিত্র ছিল এক অসফল পেইন্টার। আর সেজান যায় কোথায়, তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। ভেবে বসলেন জোলা তাঁকে লক্ষ্য করেই এই চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ব্যস বন্ধুত্ব গেল টুটে। এই ছবিতে সেজান এমিল জোলাকে কিছু একটা পড়ে শুনাচ্ছেন। লাইফ অব এমিল জোলা নামে এক বিখ্যাত সিনেমা আছে সেখানে জোলা আর সেজানের বন্ধুত্ব সিনেমার একটা কেন্দ্রীয় প্লট।

সেজান প্যারিই শুধু ছাড়লেন না, ইম্প্রেশনিস্ট রীতিতে আঁকাও ছেড়ে দিলেন। তিনি বলতেন ইম্প্রেশনিজমের চাইতে আরো গভীর শাশ্বত আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আঁকতে হবে। ইম্প্রেশনিজম সম্পর্কে সেজানের ক্রিটিকটা গুরুত্বপূর্ণ; সেজান বললেন, ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা ছবির পোশাকি দিকটা অর্থাৎ বাইরের উপর বেশী নজর দিচ্ছেন, ছবির গভীরত্ব, ওজন, অস্থিমজ্জা বা কঙ্কালের কথা ভাবছেন না, তাঁরা শুধু চামড়ার উপর রঙ মাখছেন।

সেজানের ছবির গাছপালা, ঘাসের নিচে যেন পৃথিবীর বুকের তলার পাথর ও এঁকেছেন। সেজানের পোট্রেইট দেখলে মনে হয় মুখের চামড়ার তলায় আছে রক্ত মাংস তাঁর তলার হাড়ের খুলি। সেজানের অনেক জল রঙে আঁকা স্টিল লাইফ পেইন্টিং আছে। বেশীরভাগ ছবিতেই আছে আপেল। সেই আপেলকে কীভাবে আরো গভীরত্ব আনা যায়, আরো নিটোল ভাব আনা যায় সেই কাজ তিনি নিষ্ঠার সাথে প্র্যাকটিস করতেন। এই স্টিল লাইফ গুলো দেখলে মনে হয় আপেল গুলি মাটির রসে ভারী, পৃথিবীর গুণ তাঁর মধ্যে। সেজানের মূল আগ্রহ ছিল ছবির ফর্মে।

ফর্ম জিনিসটা কী? পৃথিবীতে সব জিনিসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, বস্তুর বেলায় বলি গুণ আর অভিজ্ঞতার বেলায় বলি অনুভূতি। ধরা যাক আমরা একটা গ্লাসের কথা বলছি। গ্লাস হয় স্বচ্ছ বা নানা রঙের, শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর, মসৃন। এইগুলো তাঁর গুণ এই গুণ গুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিশিষ্ট রূপ তৈরি করে যা আমরা চৈতন্য দিয়ে অনুভব করি। এই ফর্ম বা গুণ গুলোর পরস্পর সম্বন্ধ বুঝতে না পারলে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের বোধ আসেনা। ক্যানভাসের সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকে প্লাস্টিক ফর্ম, এর মধ্যে ছোট ছোট ফর্মের সৃষ্টি হয় রঙে, রেখায়, স্পেসে, আলোয়। যে কোন সৃষ্টিতে ফর্ম তাকেই বোঝায় যেখানে সব গুণ বা রূপের ঐক্য আছে।

সেজানের পেইন্টিং শুধু ইম্প্রেশনিজম থেকে পোস্ট ইম্প্রেশনিজম সৃষ্টি নয়। নিজেই নিজের ফর্ম ভেঙ্গেছেন একাধিকবার। সেজানই প্রথম এবস্ট্যাক্ট পেইন্টিং এঁকেছেন। সেজান হয়ে উঠেছেন ভবিষ্যতের কিউবিজমের জনক। আরি মাতিস বলেছিলেন তিনি (সেজান) আমাদের সবার পিতা।

সেজান ছিলেন নতুন যুগের দিশারী। তাঁর কাছে মডার্ণ পেইন্টিং সর্বোতভাবে ঋণী। সেজানের ছবি, টেকনিক আর নিরীক্ষা না বুঝলে মডার্ণ পেইন্টিং বুঝতে পারাটা দুরূহ।

https://nagorikpathagar.org

আবার ইম্প্রেশনিজম: লাঞ্চন অন দ্য গ্রাস, এদুয়ার মানে

পেইন্টিং এর ইতিহাসে সম্ভবত সবচাইতে বিতর্কিত এবং রহস্যাবৃত পেইন্টিং এইটা। ঠিক কী বুঝাতে এই পেইন্টিং এঁকেছিলেন এদুয়ার মানে তা নিয়ে আজকেও আর্ট ক্রিটিকেরা তর্ক করেন। এই ছবি নিয়ে এমিল জোলার একটা কমেন্ট্রিও আছে।

একটা আধুনিক পার্কে লাঞ্চ করছে তিনজন। দুইজন পুরুষ আর একজন নারী। পশ্চাৎপটে আরেকজন নারী স্নানরতা। কিন্তু ছবির মুল ফিগার যেই নারী তিনি নগ্ন। এই নগ্নতা নিয়ে সেই নারীর কোন লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। সরাসরি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন সেই নারী। ছবির ফিগারগুলোর মধ্যে একমাত্র এই নারীই দর্শককে কনফ্রন্ট করছেন।

ছবির কম্পোজিশনটা মানে নিয়েছেন রাফায়েল আর মারকান্তিও রামোন্দির যৌথ এনগ্রেভিং দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস থেকে। (৭০ নম্বর ছবির) ডান দিকের নিচের তিনটা ফিগার দেখুন। এটা সেই ট্রয়ের যুদ্ধের প্যারিস। ইলিয়াডের মাইথলজির ক্যারেক্টার। কিন্তু এখানে তিনটা ফিগারই ন্যুড। মানের ছবিতে শুধু এই নারীটি নগ্ন। কেন?

অনেকেই মনে করেন মানে পেইন্টিংটার ইন্সপিরেশন নিয়েছেন প্যাস্টোরাল কন্সার্ট থেকে। এই ছবিটা জর্জনে বা তিশানের আঁকা। এই কনফিউশন আমার নয়, এটা ঠিক কে এঁকেছেন সেটা নিয়ে এখনো আর্ট ক্রিটিকেরা নিশ্চিত নন।

যাই হোক প্যাস্টরাল কন্সার্ট নামের (৭১ নম্বর ছবি) ল্যান্ডস্কেপে দেখা যাচ্ছে একজন নারী ফোয়ারায় পানি দিচ্ছেন, আরেকজন বাঁশী বাজাচ্ছেন, তাঁর সাথে সঙ্গত করছে আর দুইজন পুরুষ। এই ছবিতে নারীকে প্রকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার সাথে একমাত্র সুরের সাহায্যেই কমিউনিকেইট করা যায়।

ছবি নম্বর ৬৯: লাঞ্চন অন দ্য গ্রাস - এদুয়ার মানে

কিন্তু এদুয়ার মানের এই ছবিতে নারী কোন মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার নন, যিনি বাই ডিফল্ট নগ্নিকা। আধুনিক মহিলা যিনি পোশাক খুলে ফেলেছেন। আর মহিলাটি বাস্তবের জীবনে মানের মডেল ভিক্টরিন মেরুন। ক্যানভাসের বাম দিকে স্টিল লাইফে আধুনিক খাবার

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৭০: দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস- রাফায়েল আর মারকান্তিও রামোন্দির যৌথ এনগ্রেভিং

এমনকি পানীয়ের বোতল। পুরুষের পোশাক বিশ শতকের ফ্রেঞ্চ ধনীদের পোশাক।

ছবি নম্বর ৭১: প্যাস্টোরাল কন্সার্ট - জর্জনে বা তিশান

আমি যখন প্রথম এই পেইন্টিংটা প্যারীর মুজে দরসেতে দেখি, আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেম। নগ্নতার জন্য নয়, কেমন যেন অস্বস্তি হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই নারীটা ছবির অংশ না হলেই ভালো হতো। অনেক বলেন ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য বেস্ট ইম্প্রেশন। পরে যখন হেগেল পড়েছি, এনলাইটেনমেন্ট পড়েছি, মডার্নিজমের ক্রিটিক পড়েছি তখন আমি মনে হয় ছবিটার অর্থ কিছুটা ধরতে পেরেছি। এই নগ্নিকা হচ্ছেন প্রকৃতি যাকে মডার্নিজম আদার করে দিয়েছে। প্রকৃতিকে আদার আর

https://nagorikpathagar.org

প্রতিপক্ষ না করলে মডার্নিজম টেকেনা। তাই নগ্নিকাকে আমাদের এই ছবিতে মেনে নিতে কষ্ট হয়। মানে প্রকৃতির এই আদারনেসই নগ্নিকা নারী, যা মানে ফুটিয়েছেন দারুণ মুনশিয়ানায়। ছবি তখন আর শুধু ছবি থাকেনা, আপনাকে ফিজিক্যালি যেন ধাক্কা দেয়।

এবার দেখুন, নগ্নিকার চোখ। এইবার মনে হয় তাঁর চোখে বিষাদ দেখতে পাবেন। মানুষ নিশ্চয় একদিন প্রকৃতির সাথে তাঁর বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করবে। সেদিন মডার্নিজমের শুরুর দিনগুলোতে মানে যেই বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন তুলিতে এঁকে শিল্পের ভাষায়; তা মানব সভ্যতার এক দুঃসহ সময়কে অতিক্রম করার তাগিদ দিয়েছিল সেটা হয়তো কেউ কেউ মনে করবে। আর অভিবাদন করবে মানেকে নিঃশব্দে।

ছবি নম্বর ৭২: লার্জ বেদার্স - সেজানের বেদার্স

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৭৩: এক্টিও আর ডিয়ানার তিশান

সেজানের বেদার্স

রেনেসাঁ থেকেই মানুষের শরীর চিত্রকলার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ বলে বিবেচিত হয়েছে। শরীরকে ঘিরেই শিল্পীরা তাঁর আবেগ আর ইমোশনকে ব্যক্ত করেছে। সেজানের শেষ জীবনে বিশ শতকের শুরুতেই মানুষের শরীরকে ডিকন্সট্র্যাক্ট করতে শুরু করেন। শুরু হয় এবস্ট্র্যাক্ট পেইন্টিং এর যুগ। সেজান আঁকেন বেদার্স সিরিজের পেইন্টিং। এই সিরিজে বেশ কয়েকটা পেইন্টিং আছে সেজানের। এই পেইন্টিংটা আছে ফিলাডেলফিয়ায় মিউজিয়াম অব আর্টে। এটা বেদার্স সিরিজের সবচেয়ে বড় পেইন্টিং তাই এটাকে বলা হয় লার্জ বেদার্স।

চিত্রশিল্পের ইতিহাসে স্নানরতাদের নিয়ে অনেকেই ছবি এঁকেছেন। তিশানের অ্যাকটিং আর ডিয়ানার এই স্নানদৃশ্যের পেইন্টিংটা প্রাসঙ্গিক। এই ছবির কম্পোজিশন সেজান ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও রুবেন্স

ছবি নম্বর ৭৪: এক্টিও আর ডিয়ানাতে পিরামিডের কম্পোজিশন - তিশান

https://nagorikpathagar.org

এঁকেছেন, এমনকি সমসাময়িক দেগাও এঁকেছেন স্নানরতাদের নিয়ে। সেজানের চ্যালেইঞ্জ ছিল কীভাবে আধুনিকভাবে স্নানদৃশ্যে ন্যুড আঁকবেন।

সেজানের বেদার্সে ফিগারগুলো দেখে মনে হয় তাঁর আঁকা এখনো শেষ হয়নি। ফিগারগুলোকে বেঁকেচুরে যেন কোন নির্দিষ্ট কম্পোজিশনে ফিট করানোর চেষ্টা করেছেন সেজান। তিশানের ৭৩ নম্বর ছবিটা দেখুন। রেনেসাঁ পেইন্টিং এর যে পিরামিডের কম্পোজিশন সেটাকে সেজান নিয়েছেন। ক্লাসিসিজমের কম্পোজিশন নিয়েছেন কিন্তু মিথিক্যাল কম্পোনেন্টটা তিনি বাদ দিয়েছেন। বাদ তো দিতেই হবে, কারণ এনলাইটেনমেন্ট এসেছে সেখানে মানুষ সব কিছুর কেন্দ্রে, মানুষ সব পারে। মানুষ হিউম্যান ফিগারের রিপ্রেসেন্টেশনকেও বদলাতে পারে, তাই সেজানের বেঁকেচুরে হিউম্যান ফিগারকে প্রেসেন্ট করছেন। সেজানের ফিগারগুলো শক্ত, নমনীয় নয়, যেন রক্ত মাংসের তৈরি নয় ফিগারগুলো যেন প্লাস্টারের তৈরি।

বিশেষ করে নারীর ফিগারগুলো, যেন টেনে লম্বা করা হয়েছে, আর একইসাথে সামনের আর পাশের চেহারা একইসাথে দেখা যাচ্ছে, এই চিত্ররীতিই পিকাসোর হাতে পূর্ণতা পাবে।

পিরামিডের স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে চোখ যখন আমাদের ছবির কেন্দ্রে ডীপ স্পেইসে নিয়ে যায় তখন আমরা দেখি একটা ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন গ্রামবাসী। আবারো সেই এনলাইটেনমেন্টের মানুষ। রেনেসাঁ পেইন্টিং এ ডীপ স্পেইসে আমরা আকাশ বা মেঘ দেখতাম। এখানেও আকাশ দেখছি কিন্তু ক্লাসিক্যাল পেইন্টিং এর আকাশের চাইতে এই আকাশ অনেক বেশী তীব্র নীল, আর এই আকাশ কোন দূরবর্তী ইমেজের ভাবনা আনেনা; বরং মনে হয় যেন আকাশ নিজেই সামনে ঝুঁকে এই মানুষের উপরেই ঝুঁকে পড়েছে।

এই ছবির কোন মডেল ছিলনা, সেই মডেলের একচুয়াল রিপ্রেসেন্টেশন তাই দরকার নেই। এইটা বুদ্ধির নির্মান। বুদ্ধির কাজই এবস্ট্র্যাকশন করা। এটা কান্টের সেই বুদ্ধির সর্দারি। যেই বুদ্ধির কাজ সেনসুয়াল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত নয়, বুদ্ধির আর যুক্তির জগত। যেই জগতে আরো অনেকদিনের জন্য ইন্দ্রিয়ের জগত নির্বাসনে যাবে। বুদ্ধির রাজত্ব শুরু হবে। বুদ্ধির নির্মাণ দিয়ে স্পেইস আর ফর্মের ইলিউশনের বিরুদ্ধে বিশ শতকের শিল্পীরা বিদ্রোহ করবে। সেজান তাঁর শুরুটা করে দিলেন এই ছবি দিয়ে।

ভ্যান গগ: পোস্ট ইম্প্রেশনিজম

ভ্যান গগ আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট পেইন্টার। তাঁর পেইন্টিং নিশ্চয় আমাদের আগ্রহের বিষয়, কিন্তু তাঁর পাগলামোও তাঁকে বেশ পরিচিতি দিয়েছে। ভ্যান গগ যে ধরণের ছবি এঁকেছেন, যেই টেকনিকে এঁকেছেন তা আগে কেউ কখনো দেখেনি। ভ্যান গগের জীবন আরম্ভ হয় এক ছবির দোকানে। চাকরি বেশিদিন টেকেনি, কারণ ক্রেতার সাথে দুর্ব্যবহার করতেন ভ্যান গগ। কিছুদিন স্কুলে মাস্টারি করলেন, বদমেজাজের জন্য সেই চাকরিও গেল। পাদ্রী হবার চেষ্টা করলেন, ভর্তিও হলেন থিওলজি স্কুলে, কিছুদিন ক্লাস করে ভালো লাগলো না; ছেড়ে দিলেন সেই স্কুল। এরপরে বেলজিয়ামে গেলেন খনি মজুর হয়ে কাজ করতে। এই সময় তিনি ছবি আঁকা শুরু করলেন। তাঁর ভাই প্যারিসের এক আর্ট গ্যালারির ম্যানেজার

https://nagorikpathagar.org

তাঁর অনুরোধে প্যারিসে গেলেন ভ্যানগগ ছবি আঁকা শিখতে। ইম্প্রেশনিস্টরা ছবি আঁকতেন রঙয়ের ফুটকি আর আঁচড় দিয়ে, ভ্যানগগ আঁকলেন লম্বা লম্বা সুতোর মত বাঁকা বাঁকা রেখা দিয়ে। ভ্যানগগের ছবিতে এতো আলো আর কন্ট্র্যাস্ট যা আগের কোন ছবিতে দেখা যায়নি। ভ্যানগগের টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি ছিল, তাঁর কারণে তাঁর বাই পোলার পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার ছিল। বাই পোলার ডিজঅর্ডারের রোগী

ছবি নম্বর ৭৫: স্টারি নাইট - ভ্যানগগ

কিছু সময় তীব্র বিষাদের পরে কিছু সময়ের অস্বাভাবিক উল্লাসে ভোগে। ভ্যানগগ নিজের কান কেটে তাঁর বান্ধবীকে ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সেই বান্ধবী তাঁর প্রেমিকা ছিলনা, নেহাত কফি শপের এক পরিচিতা পরিচারিকা ছিল। পল গোগ্যা ভ্যান গগের বন্ধু ছিল, গগ্যা একসাথে থেকেছেনও কিছুদিন ভ্যানগগের বাসায়। এহেন বন্ধুর সাথে ঝগড়া হওয়ায় ভ্যানগগ একদিন ক্ষুর হাতে গগ্যাকে তাড়া করেছিলেন। গগ্যা পালিয়ে বাঁচেন, কিন্তু ভ্যানগগের রাগ পড়েনা, এই রাগেই তিনি নিজেই নিজের হাতে ক্ষুর বসিয়ে দেন। শেষ জীবনের কয়েক বছর তাঁকে উন্মাদ আশ্রমেই কাটাতে হয়। মাঝে মাঝে কিছুদিন ভালো হয়ে উন্মাদ আশ্রম থেকে ছাড়া পেলেও আবার তাঁকে ভর্তি হতে হতো। উন্মাদ আশ্রমেও এই শিল্পী কিছু বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন। ১৮৯০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে, এই প্রতিভাবান শিল্পী গুলি করে আত্মহত্যা করেন। ভ্যানগগের একটা বিখ্যাত ছবি স্টারি নাইট। নীল অন্ধকারে হলুদ তারা আর চাঁদ। এই ছবিটাও উন্মাদ আশ্রম থাকার সময়ে আঁকা। গ্রামের রাতের আকাশ ভ্যানগগ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করতেন। তাঁর বোনকে ফ্রান্সের আর্ল থেকে লেখা এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, তিনি সকালের আগের রাতের

https://nagorikpathagar.org

আকাশে অনেক সময় ধরে তারা দেখেছেন, কী বিশাল না দেখাচ্ছিল সেই তারাগুলোকে। তাঁর বোনকেই আরেক চিঠিতে জানাচ্ছেন, রাতের রঙ দিনের চাইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ, রাতের রঙ গুলো অতি উজ্জ্বল বেগুনি, নীল আর সবুজ। কিছু কিছু তারা লেবুর মতো সবুজ, কিছু গোলাপি, সবুজ, কোন মতেই কালচে নীল আকাশে সাদা রঙের ফোঁটা দিয়ে এই সৌন্দর্য ধরা যায়না। হলুদ আর নীলের এই অপূর্ব কন্ট্র্যাস্ট আর কখনো পেইন্টিং এর ইতিহাসে ব্যবহার হয়েছে কিনা জানা নাই। এই ছবিতে যে ব্রাশের টান দেয়া হয়েছে ভ্যানগগ নিজেই বলেছেন সেই ধারণা নিয়েছেন মধ্যযুগের কাঠ খোদাইয়ের টেকনিক থেকে; মোটা মোটা দাগ আর সিমপ্লিফাইড ফর্ম। এই ছবিটা যখন প্রদর্শিত হচ্ছিল তখন ভ্যানগগ তাঁর ভাইকেও বলেছিল, এই ছবিটা ভবিষ্যতের শিল্পীদের কীভাবে আরো ভালো রাতের ছবি আঁকা যায় সেটার পথ দেখাবে। হয়েছিলও তাই, ভবিষ্যেতের এক্সপ্রেশনিজমের ভিত্তি তৈরি করে দেয় এই ইমেজ, আর সম্ভবত ভ্যানগগের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিরও মর্যাদা পায় এই পেইন্টিংটা।

পল গগ্যা

গগ্যা ছোটবেলায় বাড়ি পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়েছিলেন। জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা দেশে। ফিরে এসে ছবি আঁকা শিখলেন। আগেই জেনেছি ভ্যানগগের সাথে বন্ধুত্বও ছিল গগ্যার। ছোটবেলার দেখা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো খুব টানতো গগ্যাকে। একদিন হঠাৎ বাক্স পেটরা গুছিয়ে তাহিতির জাহাজে উঠে বসলেন। তাহিতিতে তাহিতিবাসির অজস্র ছবি আঁকলেন। তাহিতির আলো, নিজস্ব আঁকার

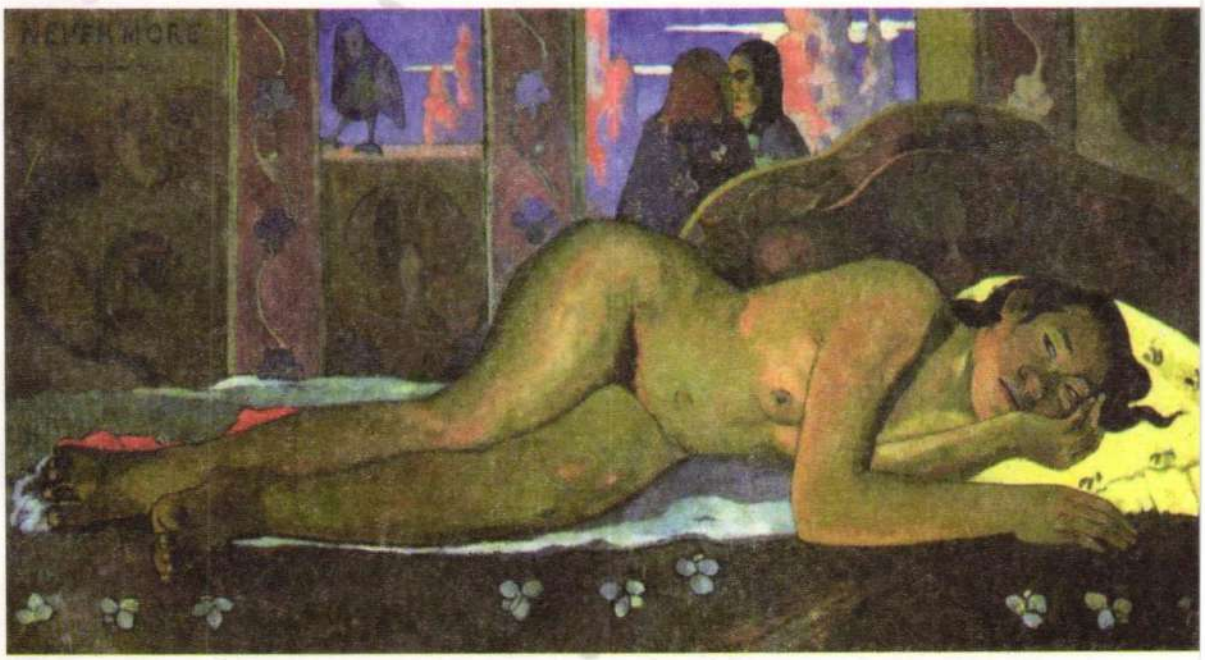

ছবি নম্বর ৭৬: নেভারমোর - পল গগ্যা

https://nagorikpathagar.org

পদ্ধতি আর এনলাইটেনমেন্টের মন দিয়ে গগ্যা এক নতুন ধরণের ছবি উপহার দিলেন পৃথিবীবাসিকে। প্রচলিত ফর্মকে, রঙের ব্যবহারকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেলেন গগ্যা।

গগ্যার এই ছবিটার নাম নেভারমোর, মানে "আর কোনদিন নয়"। এই ছবিটার রস আস্বাদন করতে হলে পেইন্টিং এর বাইরে গিয়ে একটু কবিতার খোঁজ নিতে হবে। এডগার এলেন পোর একটা কবিতা আছে র‍্যাভেন নামে, মানে দাঁড়কাক। সেই কবিতায় এক হতাশ বিষন্ন প্রেম প্রত্যাখাত মানুষের ঘরে এক দাঁড়কাক ঢুকে পরে। সেই দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে বসে তার দরজার উপরে থাকা এথেনা মূর্তির উপরে। এই এথেনা হচ্ছে প্রজ্ঞার বা উইশডমের দেবী। লোকটি আবিষ্কার করে দাঁড়কাক কথা বলতে পারে। লোকটি যাই জিজ্ঞেস করে দাঁড়কাক উত্তর দেয় "নেভারমোর"। এই একটা কথাই দাঁড়কাক শিখেছে। গগ্যার ছবির নামও নেভারমোর। ৭৬ নম্বর ছবিতে দাঁড়কাককেও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন।

ছবিতে এক তাহিতিবাসিনি নগ্নিকা শুয়ে আছে। ইউরোপের রেনেসাঁ অন্য ন্যুড ছবির মধ্যে ছিল শরীরের আবেদন, আর শরীরের মাধুর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। এই ছবিতে শরীর মুখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে মুখ আর মাথা। মুখ আর মাথা অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। মাথার নিচের উজ্জ্বল হলুদ রঙের বালিশ মুখের উজ্জ্বলতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাহিতিবাসিনির মুখ দেখলে বোঝা যায় সে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। এইটাই ইউরোপের থিংকিং সেলফ। হেগেল আর কান্ট ঘুরে যারা সবকিছুর উপরে বুদ্ধির সর্দারি মেনে নিয়েছে। সেনসুয়াল বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের যাদের কাছে কোন মূল্য নেই। এরা একটা বিষয়ই শিখেছে যুক্তি, যুক্তি আর যুক্তি, তারা সেই এডগার এলেন পোয়ের দাঁড়কাকের মতো যে শিখেছে একটাই শব্দ "নেভারমোর"।

ছবি নম্বর ৭৭: ড্যান্সার- আরি মাতিস

https://nagorikpathagar.org

সবকিছুর জবাবে একটাই শব্দ। নগ্নিকার উজ্জ্বল মুখশ্রীর অবলম্বন হচ্ছে কলোনিয়াল বালিশ, যা কলোনি মাস্টারের ভাষায় বর্বরদের সভ্য করার প্রজেক্ট। যেন কলোনি মাস্টারের উপরে ভর দিয়ে আলোকায়িত হচ্ছে নগ্নিকার মনন।

এনলাইটেনমেন্টের আর মডার্নিজমের আরেক শৈল্পিক ক্রিটিক গগ্যা করলেন তার অসমান্য মেধা আর শিল্পবোধ দিয়ে।

ফোবিজম, আরি মাতিস

ইমপ্রেশনিস্টদের যেমন গালাগালি জুটেছিল, আর ইম্প্রেশনিজম নামটা গালি দিয়ে দেয়া ঠিক তেমনি ফোবিস্টদের নামটাও তাদের সমালোচকদের দেয়া। ইমপ্রেশনিস্টদের সমালোচকেরা অতো নির্দয় ছিলেন না, কিন্তু ফোবিস্টদের সমালোচকরা ক্ষেপে গিয়ে এই চিত্রশিল্পীদের "জানোয়ার" বলেছিল। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ফোবস শব্দের অর্থ 'বন্য জন্তু'। ১৯০৫ সালে মাতিস, দেরায়া, ভলামিঙ্ক, ব্র্যাক, রুয়াল্ট এবং আরো কয়েকজন মিলে প্যারিসে একটা প্রদর্শনী করলেন। সমালোচকেরা বললেন, এসব হচ্ছে রঙের বাক্স নিয়ে বাচ্চাদের ছেলেমানুষি বর্বর খেলা। কিন্তু এই শিল্পীদের কাজ ছিল ইম্প্রেশনিস্ট আর পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টদের কাজের স্বাভাবিক পরিণতি। ভ্যান গগের কড়া রঙ, সেজানের ভলিউম আর ইমপ্রেশনিস্টদের কম্পোজিশন

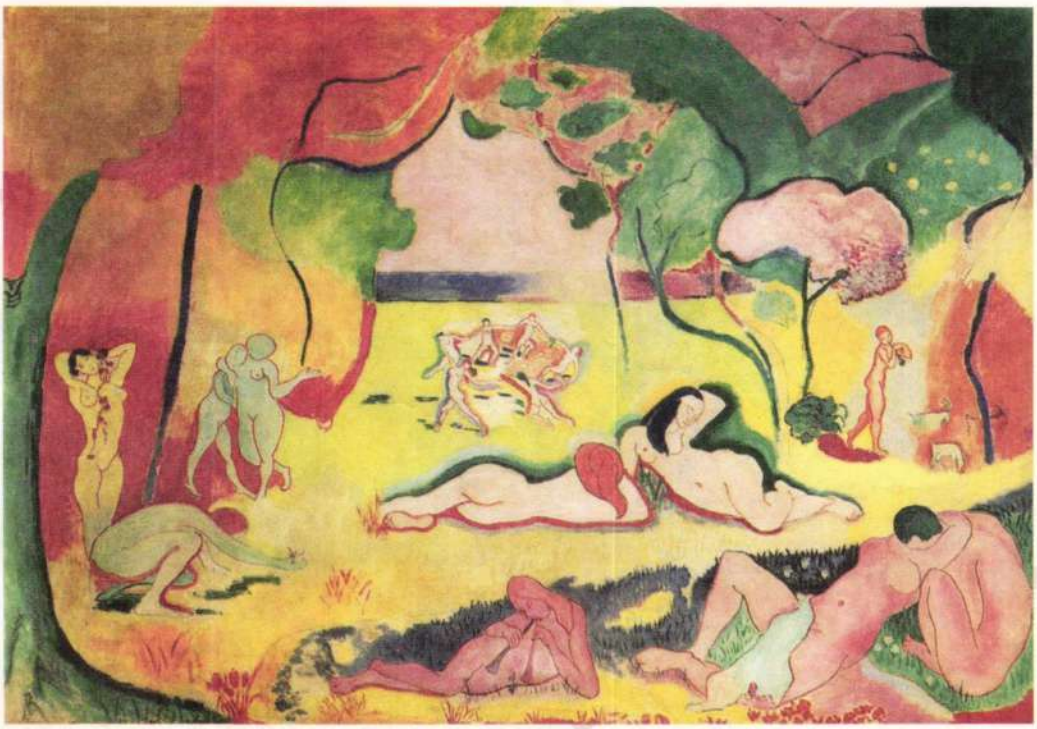

ছবি নম্বর ৭৮: হ্যাপিনেস অব লাইফ- আরি মাতিস

https://nagorikpathagar.org

এই নিয়ে হল ফোবিস্ট ছবির ক্যানভাস। ফোবিস্টরা বললেন, ছবি হচ্ছে আসলে একটা সমতল জমির উপরে শৃঙ্খলাবদ্ধ রঙের সমাবেশ। ফোবিস্ট আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি কিন্তু তা তৈরি করে দিয়ে গেল আধুনিক পেইন্টিঙের গতিমুখ।

আরি মাতিস ছিলেন অন্যতম ফোবিস্ট। মাতিসের ছবিতে এলো শিশুর অপাপবিদ্ধ দৃষ্টি আর নিখুত নক্সা। মাতিস যা দেখেন তা আঁকেন না, স্বাভাবিক রঙও লাগান না। তাঁর ছবিকে শিল্পবোদ্ধারা বলেন কলরড শেইপস। এখানে ফিগারকে ইচ্ছেমত ভেঙে নতুন ফর্মে আঁকবেন মাতিস, কিন্তু ছবির অন্যান্য ফর্মের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে দেবেন যে ফিগারের অদ্ভুত গড়ন আর চোখে আঘাত করবেনা। মাতিসের ছবির ফিগারগুলি চ্যাপ্টা; অথচ কি মনোরম আর উল্লাসময়। মাতিসের ফিগারের ফর্ম কনটেন্টের সাথে মিলে যায় অদ্ভুতভাবে। মডার্ন পেইন্টিং ডেপথের ইলিউশন আর ক্যানভাস যে আসলে সমতল বা ফ্ল্যাট এই দুইয়ের যে কনফ্লিক্ট তাকে নতুন করে উপস্থাপন করে।

মাতিসের এই ড্যান্সার ছবিটা সবচেয়ে বিখ্যাত। পাঁচটা ফিগার হাত ধরাধরি করে নাচছে। এই মোটিফটা এতো প্রিয় ছিল মাতিসের; তাঁর হ্যাপিনেস অব লাইফ ছবিতেও এই ড্যান্সিং কম্বিনেশনটা সেন্ট্র্যাল ফিগার (৭৮ নম্বর ছবি)। এই মোটিফটা ধার করেছেন মাতিস জার্মানির রেনেসাঁ পেইন্টার লুকাস ক্রানাখের কাছে থেকে। লুকাসের দ্য গোল্ডেন এইজ থেকে (৭৯ নম্বর ছবি)। সেই ইউটোপিয়ার গোল্ডেন এইজ যা গ্রিক

ছবি নম্বর ৭৯: লুকাসের দ্য গোল্ডেন এইজ - আরি মাতিস

https://nagorikpathagar.org

কবি হেসিওড এঁকেছিল তাঁর ওয়ার্ক্স এন্ড ডেইজ কবিতায়। যেখানে চিরশান্তি, কোন চিন্তা নেই কারো, এমনকি চাষও করতে হয়না, প্রকৃতি উদার হাতে মানুষের সব চাহিদা মেটায়।

মাতিসের ফিগারগুলোর পিছনে, ঘাস আর পানি। অসম্পূর্ণ ফিগার; মাতিস কোন বিশেষ ফিগার আঁকেন নাই। এঁকেছেন সেই সামান্য বা সার্বজনীন মানুষকে। তাই ফিগারগুলোকে মানুষ বলে চেনা যায়, কিন্তু বিশেষ কোন মানুষ বলে চেনা যায়না। মাতিস ধরেছেন সেই বৈশিষ্ট্যকে যা মানুষকে মানুষ বলে চিনিয়ে দেয়।

মাতিস এঁকেছেন লুকাসের আঁকা সেই প্রাচীন ইউটোপিয়া। কিন্তু এই পেইন্টিং লুকাসের কপি নয়, একটা তফাত আছে লুকাসের সাথে। সেটাই এই ছবিটার মূল কথা। সামনের দুটো ফিগারের হাত পরস্পর থেকে ছুটে গেছে। যদিও ছুটে যাওয়াটা দেখা যাচ্ছেনা, কারণ তা পিছনের ফিগারের পায়ের সাথে ওভারল্যাপ করেছে এবং আপনাকে পূর্ণ গোলাকৃতির ইলিউশন দিচ্ছে। কিন্তু আপনি খেয়াল করলে দেখবেন সেই তাল কেটে গেছে। সেই যৌথ কৌম সমাজ আর নাই। মডার্নিজম যাকে প্রথম আঘাতেই ভেঙে দেয়। কিন্তু সেই ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক আপনার সামনেই। লুকাস এঁকেছিলেন ছয়টা ফিগার, আর মাতিস পাঁচটা। বিদীর্ণ সামাজিক সম্পর্কের বাকী জায়গাটা আপনার। আপনি পারেন সেই ভেঙে যাওয়া সমাজ সম্পর্ককে আবার পূরণ করতে। আপনি ছবির সাথে একাত্ম হবার একটা তাগিদ অনুভব করবেন। এই ছবিটা যেন আপনাকে ডাকে। আজকের দিনে আপনার কর্তব্যও স্মরণ করিয়ে দেয়। এজন্যই এই ছবিটা একটা মহান শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে।

জর্জ ব্র্যাক: কিউবিজম

পেইন্টিং এর জগত সেজান থেকেই এবস্ট্র্যাক্ট ফর্মের দিকে ঝুঁকেছে। সরলভাবে বলতে গেলে সেজানই এবস্ট্র্যাক্ট পেইন্টিং এর জনক। এবস্ট্র্যাকশন সংক্রান্ত আগের আলাপটা যদি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেই তাহলে হয়তো বাহুল্য হবেনা, এবস্ট্র্যাকশন হচ্ছে বুদ্ধির নির্মান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের রিপ্রেজেন্টেশন নয়। আধুনিক পেইন্টারদের জন্য বিবেচ্য হল; তাঁরা কী আঁকছে তা জরুরী নয়, বরং কীভাবে আঁকা হচ্ছে সেটা গুরুত্বপুর্ণ। বিংশ শতকের শুরুতে এবস্ট্র্যাক্ট পেইন্টিং এর কিউবিস্ট ধারা শুরু হয় জর্জ ব্র্যাক আর পিকাসোর হাত ধরে। কিউবিজম বললে আমরা শুধু পিকাসোর কথাই বলি, কিন্তু জর্জ ব্র্যাকের ছবি না দেখলে পিকাসোর ছবিগুলো বুঝতে অসুবিধাই হবে।

কিউবিস্টরা বললেন, ছবির ক্যানভাস তো জানালা নয়, বরং দেয়ালে টাঙানো একটা ফ্লাট সারফেস। সেখানে রিয়েলিটির যে ইলিউশন আঁকা হচ্ছে এটা মায়া, এই মায়া ছেড়ে বাস্তবে জিনিসটা দেখতে যেমন সেটাকে ভেঙ্গেচুরে নানা লেয়ারে যদি দেখানো যায় তবেই না রিপ্রেজেন্টেশন সার্থক হবে। রেনেসাঁর সময় থেকে ছবি আঁকার জন্য যে পার্স্পেক্টিভ ব্যবহার করতেন পেইন্টাররা তা কিউবিস্টরা মানলেন না, এমনকি ব্যারোকের ফোরশর্টেনিং বাদ দিলেন। স্পেইসের ধারণাকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করলেন। অবজেক্টকে ভেঙে সেটাকে নানা এঙ্গেল থেকে দেখে ফ্লাট স্পেসে সেগুলোকে পুনস্থাপন করলেন। খেয়াল করলে দেখবেন এটাই সেই সময় যখন পরমাণু তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে, বস্তুকণাকে ভেঙে তাঁর সুক্ষ্ম রূপকে

https://nagorikpathagar.org

উপস্থাপন করছে বিজ্ঞান। এইসময়েই পেইন্টিং এর সব আগের কাঠামো ভেঙে ফেললেন কিউবিস্টরা।

কিউবিজম মুভমেন্টের দুটি অধ্যায়, এনালাইটিক কিউবিজম আর সিনথেটিক কিউবিজম। আমরা জর্জ ব্র্যাকের দুই ধারার দুইটা ছবি নিয়ে আলাপ করবো। ৮০ নম্বর ছবিটার নাম ম্যান্ডোরা, এটা এনালাইটিক কিউবিজম পেইন্টিং। এনালিটিক কিউবিজমে বস্তুকে খুব গভীর পর্যবেক্ষণ করে সেটাকে ফ্ল্যাট জ্যামিতিক

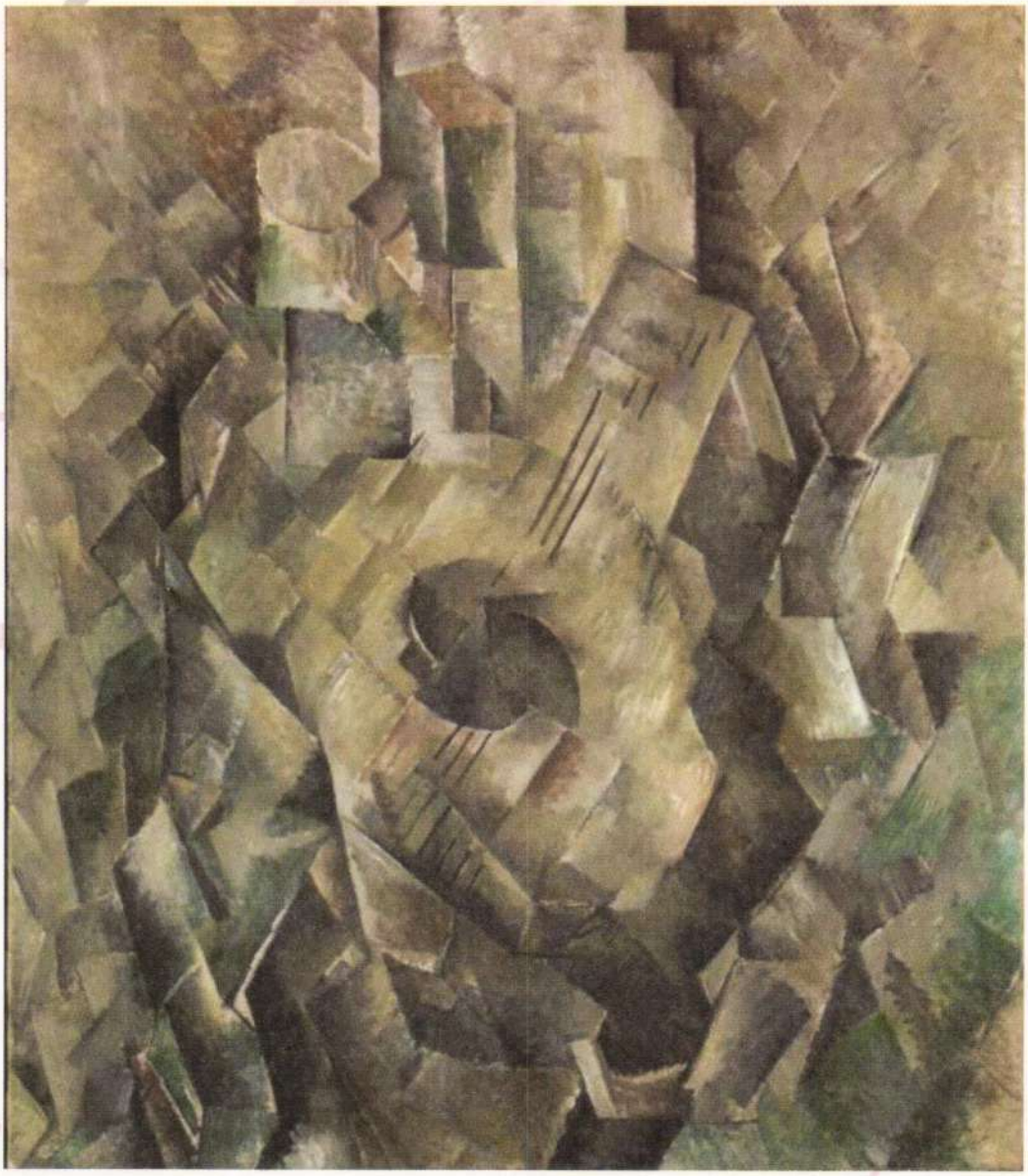

ছবি নম্বর ৮০: ম্যান্ডোরা - জর্জ ব্র্যাক

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৮১: বটল এন্ড ফিসেশ - জর্জ ব্র্যাক

শেইপ, লাইন আর এঙ্গেলে পরিবর্তিত করা হয়। ছবির মধ্যে পরস্পর একটা আরেকটাকে ছেদ করে যাওয়া স্তর থাকবে। গাঢ় কালো, বা গ্রে শেডে ছবি আঁকা হবে অনুজ্জ্বল রঙে। রঙের টোনের ভ্যারিয়েশন থাকবে সামান্য। আর সবচেয়ে বৈপ্লবিক যেটা আছে এনালাইটিক কিউবিজমে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার পার্স্পেক্টিভে যেমন শুধু একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে দর্শক দাঁড়িয়ে দেখছে বলে ধরে নেয়া হয় এবং সেভাবেই ছবি আঁকা হয়, সেটাকে ভেঙে কয়েকটা পয়েন্ট থেকে দেখলেন অব্জেক্টকে আর আঁকলেন সেভাবে। সেভাবেই আলো ছায়া ফেললেন অব্জেক্টের উপরে। পেইন্টিং আর অপ্টিক্যাল ইমেজ থাকলো না হয়ে উঠলো কনসেপচুয়াল ইমেজ বা বুদ্ধির নির্মাণ।

https://nagorikpathagar.org

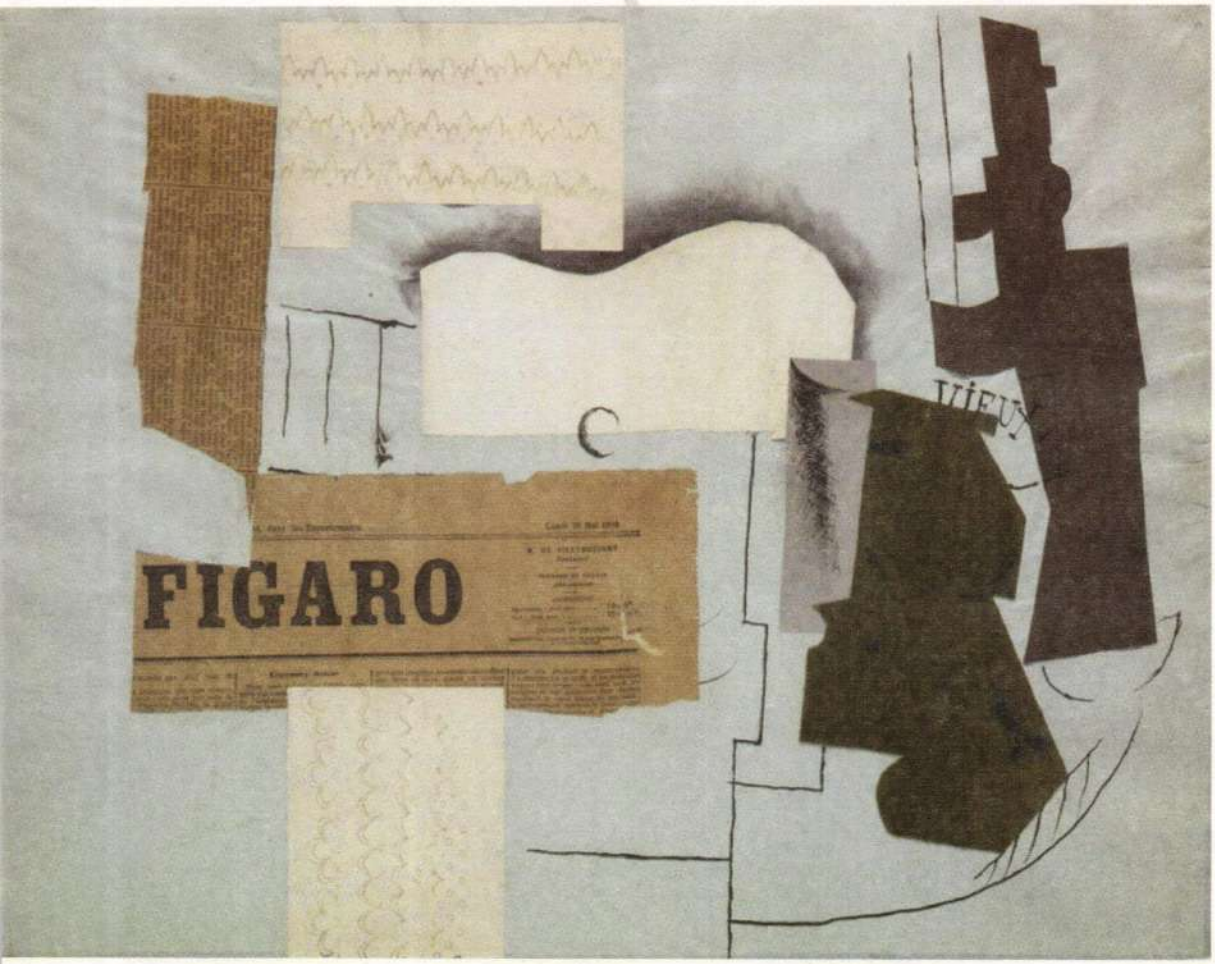

ছবি নম্বর ৮২: গ্লাস গিটার এন্ড নিউজপেপার পাবলো পিকাসো

৮১ নম্বর ছবিটাও জর্জ ব্র্যাকের, বটল এন্ড ফিসেশ; এটা সিনথেটিক কিউবিজম। উজ্জ্বল রঙ, লাইন আর শেইপ আরো বেশী সরল। এইখানে পেইন্টারেরা নন-পেইন্টিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কোলাজ করলেন, যেমন খবরের কাগজ, পেপার, এমনকি বালি, পাথর। ৮২ নম্বর ছবিটা পিকাসোর। গ্লাস গিটার এন্ড নিউজপেপার। এখানে এনালাইটিক কিউবিস্টদের মতো বোতলের ফর্ম ভেঙে সেটাকে আবার পুনস্থাপন না করে বোতলকে ইমাজিন করে নিলেন আর সেই ইমাজিনড বোতলকে ফুটিয়ে তুললেন কাগজ বা অন্য কোন বস্তুতে, সেটাই পেস্ট করে দিলেন ক্যানভাসে। তৈরি হলো চিত্রকলার নতুন ভাষা।

পিকাসোর কিউবিজম

পিকাসোর নাম শুনলেই মনে হয় গোয়ের্নিকার কথা। আমরা মনে করি গোয়ের্নিকাই সম্ভবত পিকাসোর সেরা

https://nagorikpathagar.org

ছবি। আসলে তা নয় পিকাসোর সেরা ছবি দ্য মোজায়েল দাভিনিও *Les Demoiselles d'Avignon* পেইন্টিংটি। এই পেইন্টিংটিকে বিংশ শতাব্দীর সেরা পেইন্টিং বলে বিবেচনা করা হয়। এই পেইন্টিং দিয়েই হয় একটা নতুন চিত্রধারার সূচনা। পেইন্টিংটা সেজানের লার্জ বেদার্স আর মাতিসের হ্যাপিনেস অব লাইফ (৭৮ নম্বর ছবি) এর পরম্পরাকে ধারণ করেছে। এমনকি দ্য মোজায়েল দাভিনিওতে মাতিসের হ্যাপিনেস অব লাইফের একটি ফিগারও আছে। হ্যাপিনেস অব লাইফ হচ্ছে গ্রীসের স্বর্ণযুগের ছবি, যেখানে বিস্তীর্ণ স্পেসে ফিগারগুলো দূরে দূরে প্রকৃতির ফর্মের সাথে সম্পর্কিত। মাতিসের সেই ছবির বায়ের যে ফিগার দুহাত তুলে মাথার উপরে রাখা সেটাই পিকাসোর দ্য মোজায়েল দাভিনিওর সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় ফিগার। দ্য মোজায়েল দাভিনিও এ স্পেস নেই, চারিদিকে যেন ক্লাস্টোফোবিক দমবন্ধ চাপা অবস্থা। ন্যুড ছবিতে যে উত্তেজক উপাদান থাকে সেটার বদলে পিকাসো আনলেন ক্রুড পর্ণোগ্রাফি, ডানদিকে হাঁটু মুড়ে বসা ফিগারটি দেখুন।

ছবি নম্বর ৮৩: লেস দিমোসেলেস ডি আভিগন ছবির স্কেচ, পাবলো পিকাসো

ছবিতে পাঁচজন দেহ পসারিণী বার্সেলোনার এভিগিও রাস্তায় সেই পতিতালয়ের অবস্থান। পিকাসো প্রায়ই সেখানে যেতেন। হ্যাপিনেস অব লাইফ ছবিতে ফিগারে যেই নান্দনিক বাঁকগুলো আছে সেগুলোকে পিকাসো ভেঙে নিলেন খাঁজকাটা ত্রিকোণাকার জ্যামিতিক ফিগারে। একদম বাঁয়ের ফিগারের মুখটা দেখুন, এটা পিকাসো নিয়েছেন ইবেরিয়ান ভাস্কর্য থেকে। পিকাসোকে এই ভাস্কর্যের মাথাটা ল্যুভ থেকে চুরি করে এনে দিয়েছিলেন এক কবির সেক্রেটারি। পরে অবশ্য পিকাসো ভাস্কর্যটা ফিরিয়ে দেন। বামের ফিগারের বাম হাতটা দেখে মনে হয় ডিজলোকেটেড হয়েছে। আসলে এই হাতটা আরেকটা ফিগারের যা পিকাসো পরে রিমুভ করেছেন। ছবিটা নিয়ে করা পিকাসোর স্কেচগুলো দেখলে সেই ফিগারটা দেখা যাবে।

ক্যানভাসের ছবি দেখে মনে হয় যে পিকাসো ফেলায় ছড়ায়ে ছবিটা এঁকেছেন। না সেটা নয়, তিনি এই

https://nagorikpathagar.org

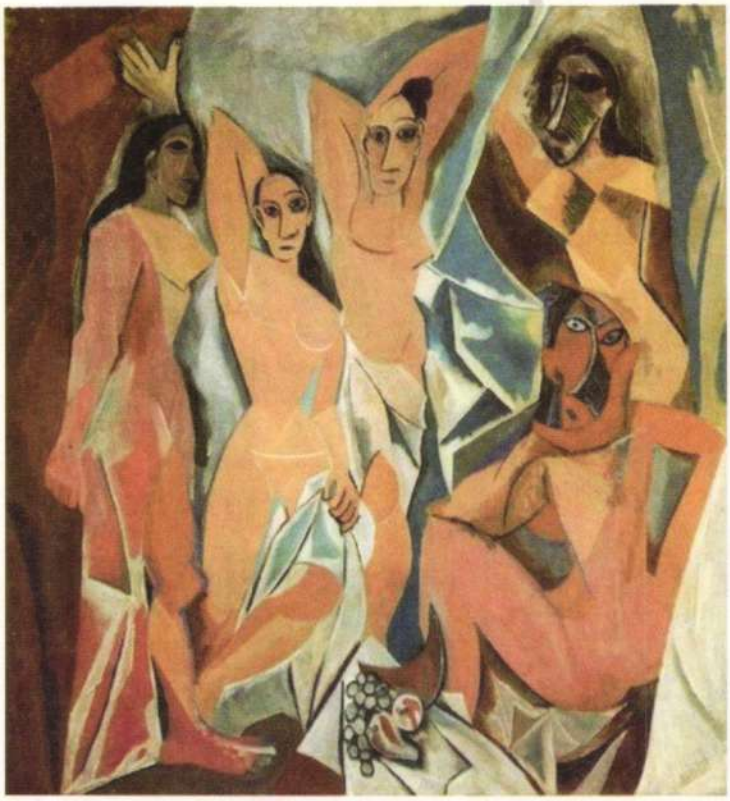

ছবি নম্বর ৮৪: লেস দিমোসেলেস ডি আভিগন পাবলো পিকাসো

ছবি আঁকার আগে প্রায় শতাধিক স্কেচ করেছেন। ৮৩ নম্বর ছবিতে স্কেচটা দেখুন। সেখানে দুটো পুরুষ ফিগার, মাঝে নাবিকের পোশাকে একজন পুরুষ, আর বামে এপ্রোন পরে হাতে বই নিয়ে একজন মেডিক্যাল ছাত্র। নাবিক এসেছে তার লালসা নিয়ে কিন্তু মেডিক্যাল ছাত্র এসেছে তার পরীক্ষণের বিষয়ে পরীক্ষা করতে। একদম ডানে আফ্রিকান মুখোশ পরে দুই নারী ফিগার মনে করিয়ে দেয় এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের আগে, সেই সময়ে পতিতালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা সিফিলিসের ভয় আর বিভীষিকা। সামনের টেবিলে আছে কিছু ফল, প্রাচীনকাল থেকে যা যৌনতার প্রতীক। টেবিলের বিপদজনক কৌণিক অংশ যেন স্বাভাবিক স্পেস থেকে উত্থিত; নির্দেশ করছে নির্বাচিতা নারীকে। এইবার দেখুন সেই নির্বাচিতা নারীকে। অন্য ফিগার আর চাদরের অংশ থেকে মনে হয় নারী দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সেই নারী শায়িতা। সময়ের সাথে স্পেইস মিলিয়ে একাকার করে দিয়েছেন। হারানো স্পেইস খুঁজে পেতে হলে আপনাকে সেটা আবিষ্কার করতে হবে, শুধু চোখ বা ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। পেইন্টিং দেখার নতুন তরিকা, এখন তা দৃষ্টিনন্দন ন্যুড, বুদ্ধি দিয়ে বিচার্য।

দাদাইজম: দুশ্যাম্প

দুশ্যাম্পকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম মোনালিসা নিয়ে লেখার সময়ে। মোনালিসার ছবিতে গোফ এঁকেছিলেন এই দুশ্যাম্প। এবার অবশ্য অন্যের ধনে পোদ্দারি নয়, নিজের শিল্পকর্ম।

তবে এটা আঁকা নয়, পেইন্টিং নয় ভাস্কর্য। নিজে হাতে বানানোও নয়, দোকান থেকে কেনা। দোকানের নামও জানে সবাই, কারণ এই বস্তু কিনে মিউজিয়ামে স্থান দেয়াতে দোকানটাও বিখ্যাত হয়ে গেছে; দোকানের নাম মট। শিল্পকর্মের বিশেষত্ব হচ্ছে, শুধু দেয়ালে না লাগিয়ে উল্টো করে টেবিলে রাখা, আর নিজের নামটা সিগনেচার করা। আর হ্যাঁ, এটার একটা নামও দিয়েছেন, ফাউন্টেন বা ঝর্না। চমৎকার

https://nagorikpathagar.org

নাম বটে, দেয়ালে লাগানো থাকলে তো কিছুক্ষন পরপর ঝর্নাই বয়ে যেত এটার মধ্যে দিয়ে। এটা শিল্প? এটা আর্ট?

যেই এক্সিবিশনে জমা দিয়েছিলেন, তারা এই মহৎ শিল্পকর্মকে রিজেক্ট করেছিল। দুশ্যাম্প এই ধরণের শিল্পকর্মকে বলতেন রেডিমেইড। তাঁর এমন আরেকটা শিল্পকর্ম তার আছে, সেটা বরফ ফেলার বেলচা; নাম দিয়েছিলেন ইন আডভ্যান্স অব আ ব্রোকেন আর্ম। এইরকম নন আর্ট অব্জেক্ট দিয়ে আর্ট তৈরি শুরু করেছিলেন কিউবিস্টরা আমরা জানি। পিকাসোর একটা ভাস্কর্য আছে প্যারিসে পিকাসো

ছবি নম্বর ৮৫: ফাউন্টেন বা ঝর্না - দুশ্যাম্প

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৮৬: বুলস হেড - পিকাসো

মিউজিয়ামে, বুলস হেড নামে, তিনি সাইকেলের হ্যান্ডেলে চামড়ার সাইকেলের সিট জুড়ে দিয়ে এই মহার্ঘ ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন (৮৬ নম্বর ছবি)। খালি কাজের মধ্যে চোখের জায়গায় দুটো ফুটো করেছিলেন।

এই পাগলামোর মানে কী? সময়টা দেখুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, এতোদিনের লালিত সব কল্পনা, মিথ ভেঙে পড়ছে, মানুষের ব্যাপক আর বর্বর মৃত্যু পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। দাদাইজমের লক্ষ্যই ছিল আমরা যেভাবে আর্টকে দেখি, ভ্যালু করি তাঁকে ভেঙে দেয়া। পৃথিবী এমন জায়গায় পৌঁছেছে, সে সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে, যেখানে একজন শিল্পী আর কিছুই করতে পারছেনা, তা সে কী করবে, যেই শিল্পকে, আর্টকে সে সৃষ্টি করেছে তাঁকে মূল্যহীন করে তোলা ছাড়া?

এখানেই প্রথম দুশ্যাম্প দার্শনিক প্রশ্ন তুললেন, আর্ট কী? শিল্পী আসলে কী সৃষ্টি করে? দুশ্যাম্পের মতে আর্ট শুধু হাতের কাজ নয়, ক্র্যাফটম্যানশিপ নয়, শিল্পীর হাতের তৈরি জিনিস নয়; আর্ট হচ্ছে কনসেপচুয়াল, বুদ্ধির নির্মাণ। আর্ট হয়ে উঠেছে আইডিয়া, অবজেক্ট নয়। তাই শিল্পীর আইডিয়া থাকলেই হয়, নিজের হাতে কোন অবজেক্ট না বানালেও চলে। দুশ্যাম্প সার্টিফাই করেছে তাই ছবি আঁকতে পারি না পারি

https://nagorikpathagar.org

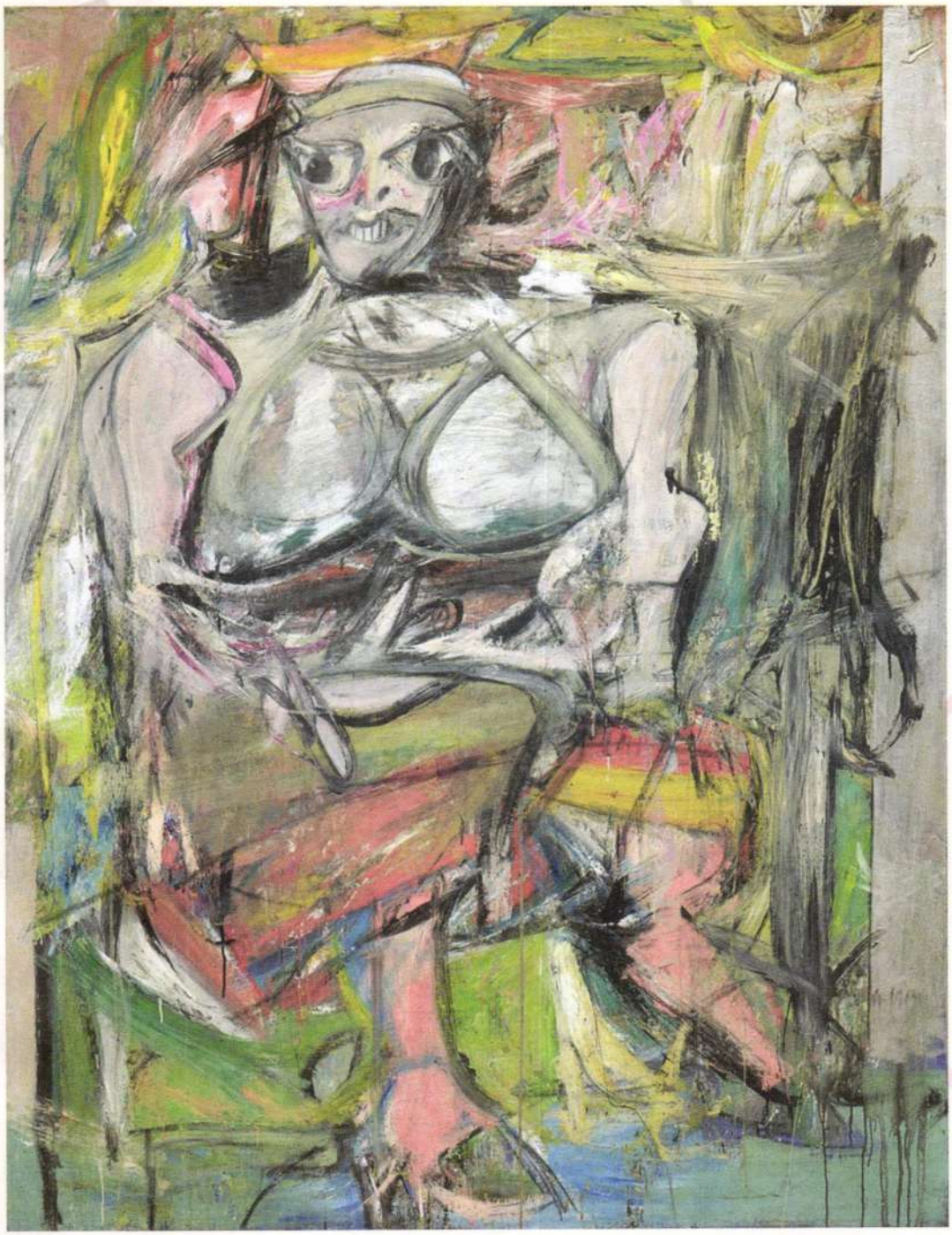

ছবি নম্বর ৮৭: উইমেন ওয়ান কুনিং

https://nagorikpathagar.org

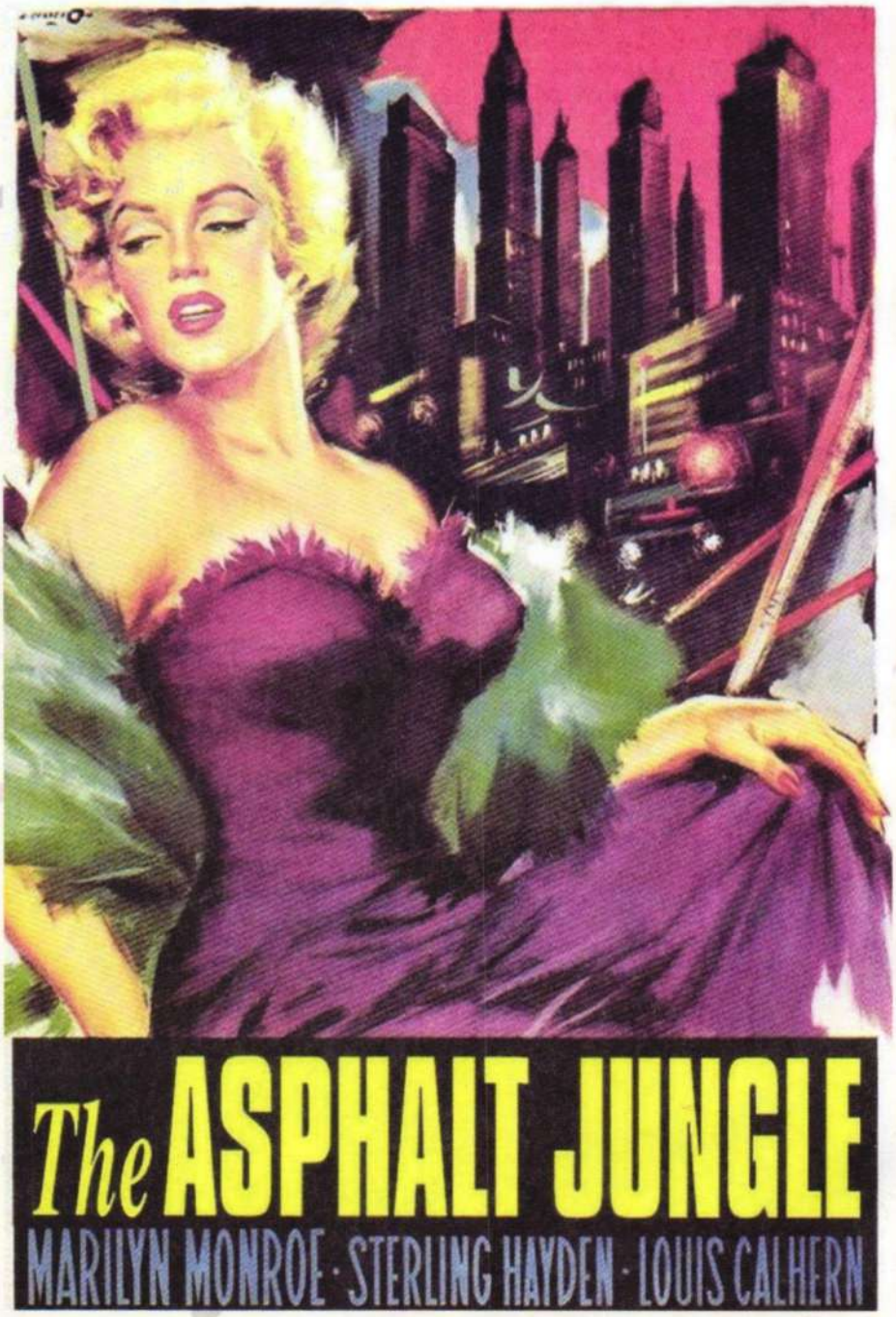

ছবি নম্বর ৮৮: মেরিলিন মানরোর সিনেমার পোস্টার

https://nagorikpathagar.org

পেইন্টার হতে আজ আর কারোই অসুবিধা নেই।

এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম: উইলিয়াম ডি কুনিং

এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম চিত্রধারার পেইন্টারেরা নিজেদের এবস্ট্র্যাক্ট বলতেন না, বলতেন প্রাইমাল। মানে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক। তারা মনে করতেন প্রাগৈতিহাসিকভাবে আমাদের সমাজের যৌথ অবচেতনে কিছু প্রাইমাল বা আদিম ইমেজ আছে, সেই আদিম ইমেজগুলো মানুষের আবেগ নয় বরং মানুষের অবস্থা

ছবি নম্বর ৮৯: প্রাগৈতিহাসিক ফার্টিলিটি দেবী

https://nagorikpathagar.org

সম্পর্কে সার্বজনীন সত্যকে তুলে ধরে। এটা সেই সময় যখন ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, দলে দলে ইউরোপীয় শরনার্থীরা আমেরিকায় এসে ভীড় করছেন। চিত্রকলার ক্লাসিক্যাল সেন্টার ইউরোপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে আমেরিকায়। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে হতবিহ্বল করে ফেলেছে। এতোদিন মানুষ যেটাকে সভ্যতা বলে জেনে এসেছে তার দানবীয় নির্মম রূপ দেখে শিল্পীরা স্তম্ভিত। এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের একজন দিকপাল বার্নেট নিউম্যান তাঁদের চিত্রধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, "কসাইখানায় রুপান্তরিত হওয়া এই বিশ্বে আমরা একটা নৈতিক সংকটে পড়েছি, মহামন্দা আর হিংস্র বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথীবিতে আমরা যা আঁকছিলাম যেমন ফুল, আয়েশ করে শুয়ে থাকা ন্যুড অথবা চেলোবাদকের ছবি, তা আর আমরা আঁকতে পারিনা।"

স্যুররিয়ালিস্টেরা যেমন ফ্রয়েড দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন, আর এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম চিত্রধারার পেইন্টারেরা প্রভাবিত ছিলেন ফ্রয়েডের ছাত্র সুইস সাইকোলজিস্ট কার্ল ইয়ং দিয়ে। যৌথ অবচেতনার আবিষ্কার কার্ল ইয়ং এর। ফ্রয়েড যেমন মনে করতেন কমপ্লেক্স তৈরি হয় পারসোনাল বা ব্যক্তিগত অবচেতন থেকে, ইয়ং বললেন কমপ্লেক্স তৈরি হয় শুধু পারসোনাল অবেচতন থেকে নয় কালেক্টিভ বা যৌথ সামাজিক অবচেতন থেকেও।

কুনিং এর উইমেন ওয়ান একটা গুরুত্বপূর্ণ এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম চিত্রধারার পেইন্টিং। ছবিটা কুনিং এঁকেছেন তিন বছর ধরে। কাছে থেকে দেখলে বোঝা যাবে ছবিতে অসংখ্য লেয়ারের উপরে লেয়ার দেয়া হয়েছে। তিনি একই ক্যানভাসে এঁকেছেন আবার মুছেছেন আবার এঁকেছেন আবার মুছেছেন, এভাবেই এগিয়েছে পেইন্টিংটা। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, আগেও বলেছিলাম, মডার্ণ পেইন্টিং এর মূল বিবেচ্য কী আঁকা হচ্ছে তা নয়, বরং কীভাবে আঁকা হচ্ছে সেটা। এই ছবির ব্র্যাশওয়ার্ক মোটা, যাকে বলা যেতে পারে মাসকিউল্যার এবং টাফ। রেনেসাঁর আগে থেকেই বসে থাকা নারীর ছবি এঁকেছেন পেইন্টারেরা, ম্যাডোনা থেকে নানা মিথিক্যাল ক্যারেক্টার। কুনিং আঁকলেন নন মিথিক্যাল নারী ক্যারেক্টার সেই একই ভঙ্গিতে। শুধু নন মিথিক্যাল ভঙ্গিতেই নয়, কমার্শিয়াল ভঙ্গিতে। যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অ্যামেরিকান সমাজ নারী চরিত্রকে পণ্যের মত উপস্থাপন করেছে ঠিক সেভাবে। যেন সেই পিন আপ গার্ল, যার আয়ত বড় চোখ, উন্নত বক্ষ, মুখ খোলা যেন আকর্ষকভাবে দাঁত দেখা যায়। ৮৮ নম্বর ছবিতে মেরিলিন মানরোর সিনেমার পোস্টার দেখুন।

ছবিটা দেখতে দেখতেই আপনি ভাববেন তাঁর হাতগুলো কোথায়, থাই কোথায়? ছবির স্পেইসে নাই হয়ে গেছে। অথবা এমনভাবে কন্সট্র্যাক্ট করেছেন পেইন্টার যা আমাদের সাধারণ ধারণার সাথে মেলেনা। কিন্তু আমাদের কালেক্টিভ অবচেতনে যেই ইমেজ আছে নারীর তা সেই প্রাগৈতিহাসিক ফার্টিলিটি দেবীর (৮৯ নম্বর ছবি), সেটার সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়। সেই ফার্টিলিটি দেবীর সাথে কুনিং মিলিয়েছেন আধুনিক যুগের পণ্য হয়ে ওঠা নারীর ইমেজ।

https://nagorikpathagar.org

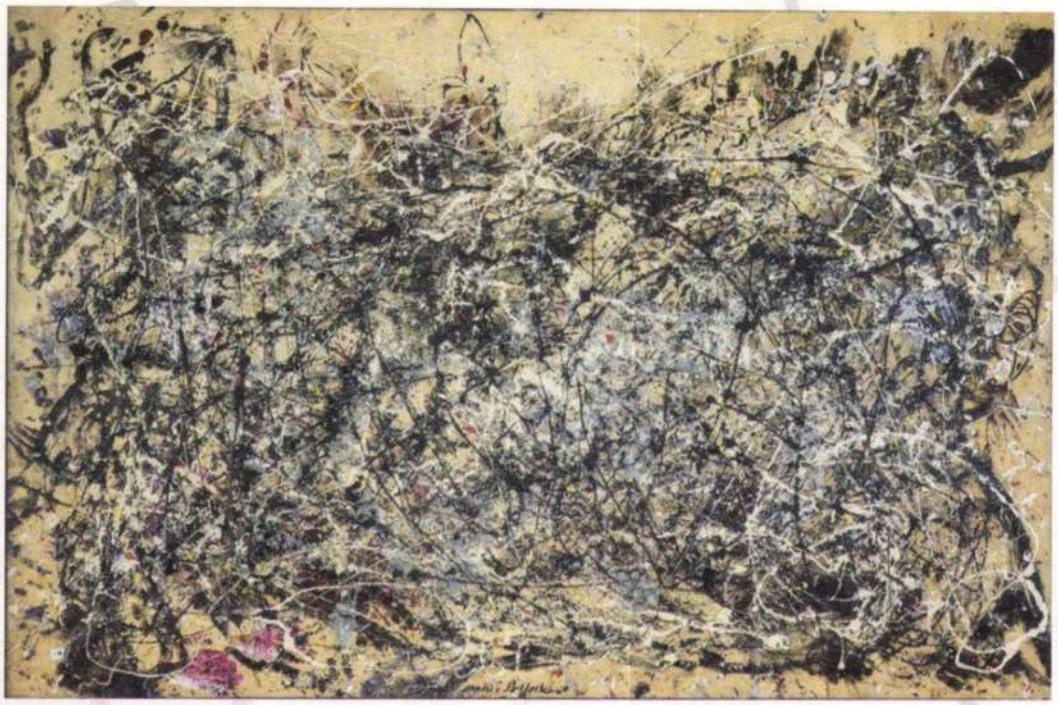

ছবি নম্বর ৯০: নাম্বার ওয়ান এ- জ্যাকসন পোলক

এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম: জ্যাকসন পোলক

এটা কি পেইন্টিং? এটা আর্ট?

ছবিটা আঁকার পরে স্ত্রীকে ডেকে এনে বিহ্বল জ্যাকসন পোলক একই প্রশ্ন করেছিলেন। ছবিটার নাম "নাম্বার ওয়ান এ"। এই ছবির ক্যানভাস ফ্রেমে আঁটকে ব্রাশ আর তুলিতে আঁকা হয়নি। আঁকা হয়েছে বললে ভুল হবে, এটা বানানো হয়েছে ক্যানভাস মাটিতে ফেলে তার উপরে রঙ ঢেলে রঙ ছিটিয়ে, রঙের টিউব ফুটো করে পেস্টের মতো করে রঙ ফেলে। ছবিগুলো যখন আঁকতেন পোলক সেই সময়ের মুভি ক্লিপ আর ছবি তুলে রেখেছিলেন। পোলক যেন ক্যানভাসের চারিদিকে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন রঙের কৌটা আর রঙ ছিটানোর জন্য ব্রাশ নিয়ে। ছবির নামটাও মিউজিক্যাল নোটের নাম যেমন হয় তেমন। পেইন্টিং ক্রিটিক হ্যারল্ড রোসেনবার্গ বলেছিলেন এটা কোন ছবি নয় এটা একটা ইভেন্ট। তিনি কীভাবে ছবি আঁকতেন দেখুন ৯১ নম্বর ছবিতে। লাইফ ম্যাগাজিন তাঁকে নিয়ে প্রচ্ছদ করেছিল : *Jackson Pollock: Is he the greatest living painter in the United States?"*

পোলক এই ধরণের ছবির নাম দিয়েছিলেন এ্যাকশন পেইন্টিং। কী বলা হচ্ছে এই ছবিতে? ওই যে আগেই বলেছি এখানে তো কী খুজবেন না, এখানে খুঁজবেন কীভাবে? ছবিটা কীভাবে আঁকা হয়েছে তাই দেখবেন, কী আঁকা হয়েছে তা নয়। তাহলেই মডার্ন এবস্ট্র্যাক্ট পেইন্টিং দেখতে গিয়ে আপনার হতাশ হতে হবেনা।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ৯১: জ্যাকসন পোলক যেভাবে ছবি আঁকতেন।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, ছবির ডান দিকে উপরে। পোলকের হাতের ছাপ। এই ছাপ অসাবধানে পড়েনি, চিন্তা করেই দিতে হয়েছে। হাতের নেগেটিভ ছাপ থাকতো কেইভ পেইন্টিং এ। সেই ছাপ আবার পজিটিভ ফর্মে এনে ৩০ হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসকে এনে যুক্ত করেন আজকের ছবির সাথে। তাহলে পোলককে কীভাবে চিনবো? এটা জানতে হবে পোলকের কথাতেই। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি প্রকৃতি থেকে আঁকেন কিনা? পোলক জবাব দিয়েছিলেন, আমিই প্রকৃতি, আই এম ন্যাইচার। তাহলে তার পেইন্টিং এ আমরা পাবো প্রকৃতির নৃত্যচ্ছন্দ।

কনটেম্পোরারি পেইন্টিং

আমরা এই ধারার কয়েকটা পেইন্টিং নিয়ে এর মধ্যেই আলাপ করেছি। তবে এই ধারার পেইন্টিং নিয়ে আলাপের সময় এটা মনে রাখতে হবে আমরা এই সময়ের মধ্যেই বাস করছি। তাই আর্টের ভাষায় যাকে বলে পার্সপেক্টিভ, সেই বিবেচনায় পেইন্টিংটাকে সময়ের ফ্রেমে ফেলে দেখার সুযোগ থাকেনা। এই ধারার

https://nagorikpathagar.org

পেইন্টিং এর কয়েকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাপ করবো। তবে এই চিত্রকলার ধারার সময়কালগুলো জেনে রাখা ভালো। চিত্রকলার মডার্ন ধারার বয়স মোটামুটি ১০০ বছর ১৮৬০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়তাকে শিল্পকলার মডার্ন সময় বলা হয়। ঐতিহাসিকভাবে এই পর্বটা শিল্প বিপবের সাথে যুক্ত। এই সময়েই একটা সমান্তরাল শিল্প আন্দোলন গড়ে ওঠে আর তা হচ্ছে এন্টি মডার্নিজম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চিত্ররীতিতে যে ক্লাসিক্যাল ভাবের ছাপ পরে সেটাই এন্টি মডার্নিস্ট আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত। পাবলো পিকাসোও এন্টি মডার্ন ধারার ছবি এঁকেছেন। পিকাসোর আঁকা এই লাভার্স ছবিটা (৯২ নম্বর ছবি) এন্টি মডার্ন ধারার ছবি। এখানে পিকাসো রাফায়েলের নিও ক্লাসিক্যাল ধারাকে অনুকরণ করেছেন। ১৯৬০ সালের আসেপাশে শুরু হয় পোস্ট মডার্ন আর্ট। এই ধারার মধ্যে থাকে কনসেপচুয়াল আর্ট, ভিডিও আর্ট, কোলাজ। পোস্ট মডার্ন আর্টের একটা মুল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "এপ্রোপ্রিয়েশন"। এর অর্থ চুরি করা নয়। বরং আগের কোন ইমেজ বা ছবি ব্যবহার করে তার ভিন্নতর ব্যাঞ্জনা উপস্থাপন করা।

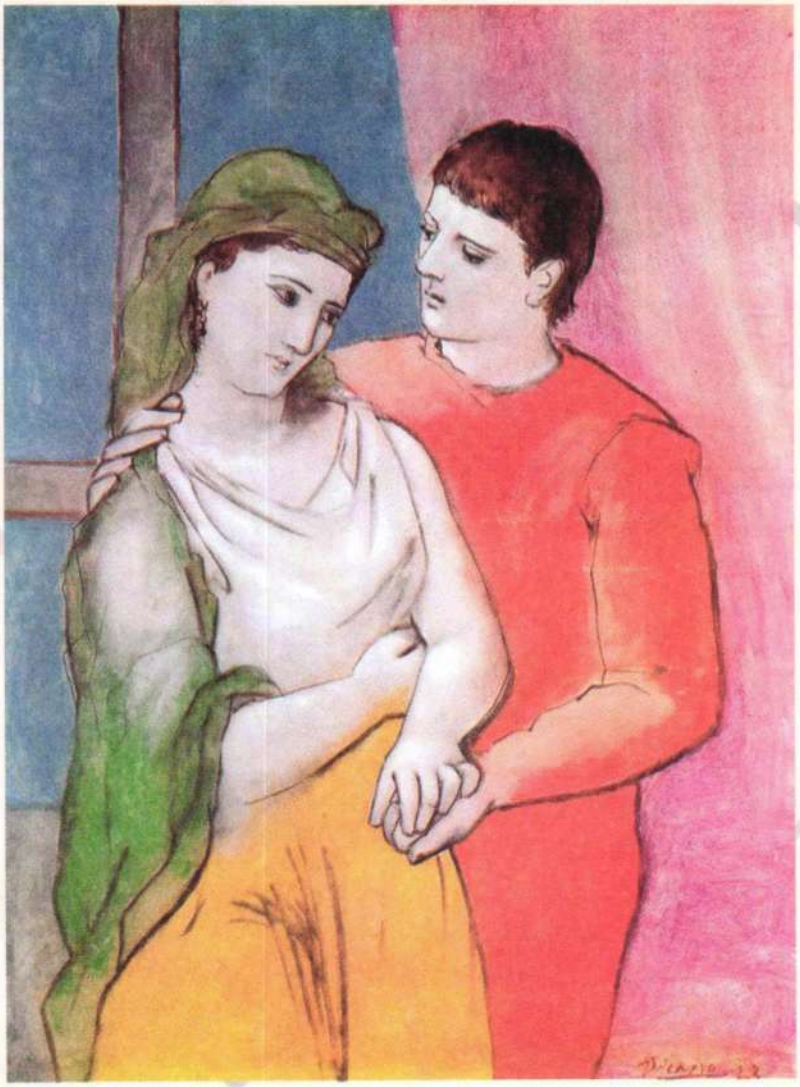

ছবি নম্বর ৯২: লাভার্স- পাবলো পিকাসো

ইটালির ষোল শতকের ম্যানারিস্ট পেইন্টার পুন্টরমোর এই ছবিটা (৯৩ নম্বর চিত্র) যার নাম ছিলো ভিজিটেশন তা নিয়ে বিল ভিওলা একটা ভিডিও তৈরি করলেন। স্টেজ থাকলো একই কিন্তু চরিত্রগুলো হয়ে উঠলো আধুনিক (ছবি নম্বর ৯৪)।

মিনিয়াপোলিসের স্কালপচার গার্ডেনের স্পুনব্রিজ এন্ড চেরি ভাস্কর্যটি একটি বিশাল চামুচের মাথায় একটা লাল চেরি। ক্লাইস ওল্ডেনবার্গের করা এই ভাস্কর্য আসলে আমাদের দৈনন্দিন বিষয়ের ম্যামথ স্কেলে

https://nagorikpathagar.org

রিপ্রোডাকশন।

২০০৮ সালে চিনে এক ভূমিকম্পে হাজার হাজার স্কুল ছাত্র মারা যায়। ধ্বংসস্তূপে হাজার হাজার স্কুল ব্যাগ

ছবি নম্বর ৯৩: ভিজিটেশন- পুন্টরমো

ছবি নম্বর ৯৪: ভিজিটেশন- বিল ভিওলা

ছড়িয়ে ছিল। এটা দেখে চাইনিজ পেইন্টার এই উইউই একটা বিশাল পেইন্টিং তৈরি করেন স্কুল ছাত্রদের ব্যাকপ্যাক দিয়ে। নানা রঙের ব্যাকপ্যাকের সমাহার করে তিনি চাইনিজ বর্ণমালায় লেখেন, *She lived happily for seven years in this world* এই প্রতিবাদি পেইন্টিঙের (ছবি নম্বর ৯৬) জন্য তার স্টুডিও বুল ডোজার দিয়ে চাইনিজ পুলিশ গুঁড়িয়ে দেয়। পিটিয়ে তাঁর ব্রেইন ইনজুরি করে দেশ ছাড়া করে চাইনিজ সরকার।

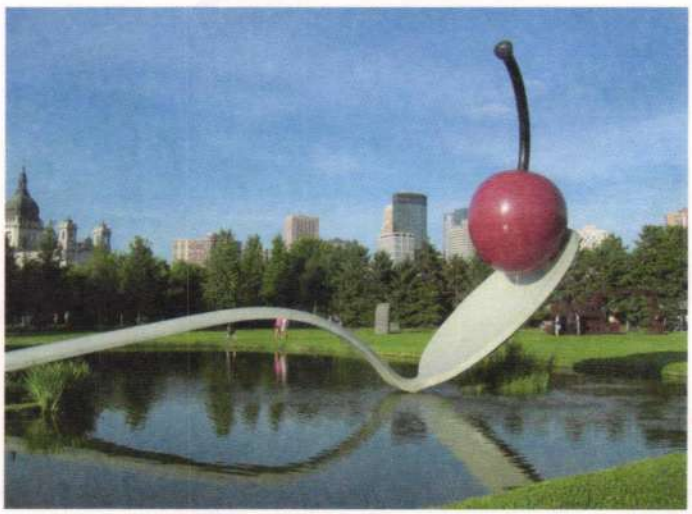

ছবি নম্বর ৯৫: স্পুনব্রিজ এন্ড চেরি- ওল্ডেনবার্গ

https://nagorikpathagar.org

অনেকে কনটেম্পোরারি আর্ট বলতে মডার্ন আর্টের ধারাকেই বুঝান। তবে খুব সুক্ষ্মভাবে বলতে গেলে ১৯১০ সাল থেকে শুরু হয় কনটেম্পোরারি আর্টের ধারা। যার ভিতরে আছে এন্টি মডার্ন আর্ট আর পোস্ট

ছবি নম্বর ৯৬: শি লিভড হ্যাপিলি ফর সেভেন ইয়ারস ইস দিজ ওয়ার্ল্ড- উইউই

মডার্ন আর্টগুলো।

কনটেম্পোরারি আর্ট এবং আইডেন্টিটি:

আধুনিক আর্ট শুধু শিল্পীকেই নয় আমাদের নিজেকেও বুঝতে সাহায্য করে। মেক্সিকোর ফ্রিদা কাহেলো একজন আধুনিক পেইন্টার। তিনি যখন ১৯৩৮ এ প্যারিসে এক্সিবিশন করতে গেলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই পেইন্টিং গুলো কি সুররিয়ালিজম নাকি মেক্সিক্যান ফোক আর্ট। ফ্রিদা জবাব দিয়েছিলেন আমি আমার রিয়েলিটিকে এঁকেছি। ফ্রিদার স্বামী ছিলেন দিয়াগো রিভেয়ারা। দিয়াগো ফ্রিদার চাইতে পরিচিত পেইন্টার ছিলেন। ফ্রিদা প্যারিসে যাবার কিছু আগে থেকে পেইন্টার হিসেবে সকলের নজরে আসতে থাকেন। প্যারিসের এক্সিবিশন ফ্রিদার জন্য হল এক বিরাট সাফল্য। পিকাসো তাঁকে কানের দুল উপহার দিলেন, লুভ মিউজিউয়াম তাঁর সব পেইন্টিং কিনে নিলো। ফ্রিদা ফিরে এলেন মেক্সিকোতে, ফিরে এসেই ফ্রিদা দিয়াগোকে ডিভোর্স দিলেন আর নিজের চুল কেটে ফেলে আঁকলেন সেলফ পোর্ট্রেইট (৯৭ নম্বর ছবি)।

তাঁর প্রত্যেকটা লাইফ ইভেন্টের সাথে তাঁর পেইন্টিংগুলো জড়িত। তিনি যখন দিয়াগোকে বিয়ে করেছিলেন তখন আঁকলেন এই ছবিটা (ছবি নম্বর ৯৮)।

আর যখন ডিভোর্স দিলেন তখন আঁকলেন চেয়ারে বসা ক্রপড চুলের ছবিটা। দিয়াগো ফ্রিদার লম্বা চুল

https://nagorikpathagar.org

আর কালারফুল পোশাক ভালোবাসতেন, ফ্রিদা সেই দুটোকেই ত্যাগ করে তাঁর সাথে ফ্রিদার বিচ্ছিন্নতা দেখালেন।

ছবি নম্বর ৯৭: সেলফ পোর্ট্রেট উইথ ক্রপড হেয়ার-ফ্রিদা কাহলো

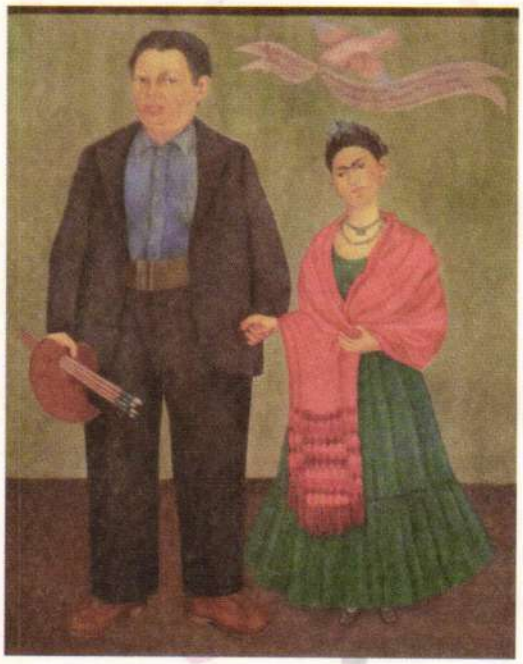

ছবি নম্বর ৯৮: ফ্রিদা এন্ড দিয়াগো রিভেরা- ফ্রিদা কাহলো

এবার আসুন আরেক ধরণের মডার্ন পেইন্টিং নিয়ে আলাপ করি। ১৯৯৩ সালে গেন লাইগন তাঁর বন্ধুদের বললেন, ধরো আমি হারিয়ে গেছি আমাকে খুঁজতে হলে আমার কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তোমরা আমাকে খোঁজার বিজ্ঞাপন দেবে। বন্ধুরা নানা জনে নানা বৈশিষ্ট্যর কথা বলল, লাইগন তাঁর সবগুলো নিয়ে উপরে উনিশ শতকের নিগ্রো দাসের ইমেজ একে তাঁর নিচে সেই বৈশিষ্ট্য গুলো লিখলেন। দশটা পেইন্টিঙের এই সিরিজের নাম দিলেন রান অ্যাওয়ে (ছবি নম্বর ৯৯)। তিনি বলতে চাইলেন সেই ইতিহাস এখনো তাঁর পরিচয়কে নির্নয় করে চলছে। এখনো আমরা সেই দাস ব্যবস্থা থেকে উত্তরিত হতে পারিনি।

https://nagorikpathagar.org

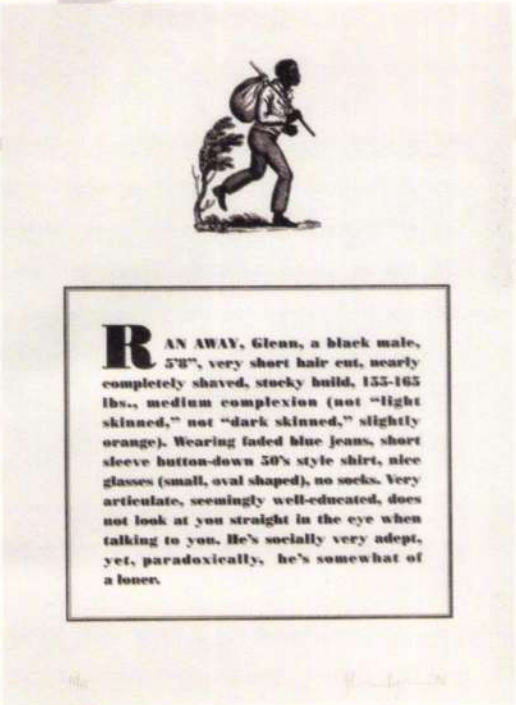

ছবি নম্বর ৯৯: রান অ্যাওয়ে- গেন লাইগন

ছবি নম্বর ১০০: মেরিলিন মনরোর ফটোগ্রাফ

১৯৬২ তে মেরিলিন মনরো মারা যাবার পরে ওয়ারহল এই ছবিটা আকেন (ছবি নম্বর ১০১)।

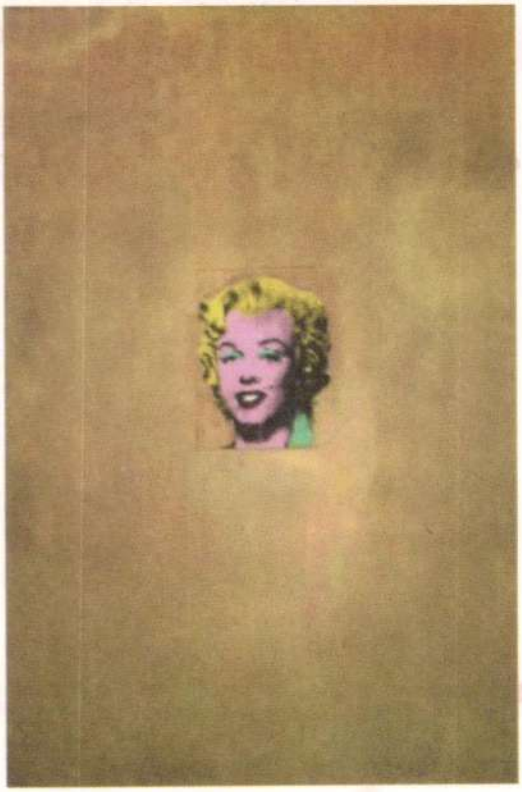

ছবি নম্বর ১০১: মেরিলিন মনরো- ওয়ার হল

সিল্কস্ক্রিন কালি দিয়ে পাস্টিক পলিমারের উপরে আঁকা এই ছবিটা মনরোর সিনেমা নায়াগ্রার একটা পাবলিসিটি স্টিল ফটোগ্রাফের রিপ্রোডাকশন।

আমেরিকা কীভাবে মনরোকে দেখতে চেয়েছিল। আমি কে সেটা আর পপুলার মিডিয়ার কাছে প্রয়োজনীয় নয় বরং আমাকে মানুষ কীভাবে দেখতে চায় সেটাই পপুলার মিডিয়া দেখাতে চায়। ওয়ারহল দেখালেন মনরোকে কীভাবে মানুষ দেখতে চায়। তাই তিনি একটা রিপ্রোডাকশনের রিপ্রোডাকশন করলেন। নির্মিত হয় মনরোর নতুন আইডেন্টিটি।

https://nagorikpathagar.org

ছবি নম্বর ১০২: এই বাড়িটির অংশ দিয়েই বিংগোর শিল্পকর্মটি তৈরী হয়।

ছবি নম্বর ১০৩: বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

মডার্ন আর্টের আইডিয়া হিসেবে কোন স্থান বা স্পেইসের ব্যবহার

মডার্ন আর্ট নানা ভাবেই স্পেইস বা পেসের ব্যবহার করেছে, যেমন ভ্যাগ গগ তাঁর স্টারি নাইটে আধুনিক সময়ের ল্যান্ডস্কেপে স্পেইস আর বিশেষ স্থানের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা আরো অভিনব হয়ে ওঠে বিংশ শতকের শেষে। ম্যাট্টা ক্লার্ক বিল্ডিং বা বাড়ির স্পেইস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতেন। তাঁর একটা উলেখযোগ্য শিল্পকর্ম নিয়ে আলাপ করছি।

এই বাসাটা ভেঙে ফেলা হবে (ছবি নম্বর ১০২)। ভেঙে ফেলার আগে ম্যাট্টা ক্লার্ক বাসার এই অংশটাকে নয়টা অংশে ভাগ করেন। তারপরে একটা অংশ রেখে দিয়ে বাকী আটটা অংশ কেটে নিয়ে আসেন (ছবি নম্বর ১০৩)। এর মধ্যে তিনটা অংশ তিনি মিউজিয়ামে রাখেন। এটাই তাঁর শিল্পকর্ম। কিছু বুঝলেন এটা দিয়ে (ছবি নম্বর ১০৪)?

ছবি নম্বর ১০৪: বিংগো- ম্যাট্টা ক্লার্ক

https://nagorikpathagar.org

দৈনন্দিন অবজেক্ট থেকে শিল্পকর্ম

ছবি নম্বর ১০৫: বেড- রবার্ট রোসেনবার্গ

শিল্পীরা যুগে যুগে প্রকৃতি থেকে কাচামাল নিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন, আর আধুনিক শিল্পীরা তৈরি বিষয়কে শিল্পের কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করলেন। আমরা এর আগেও থেকেছি পিকাসো, দুশ্যাম্প পর্যন্ত কীভাবে এই কাজ করেছেন। আধিনিক শিল্পের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। আমরা আগেই বলেছি দুশ্যাম্প এগুলোকে বলতেন রেডিমেইড। দুশ্যাম্প বলেছিলেন, "*if you introduce your taste, you go back to the old ideals of taste and taste is the great enemy of art.*"। তাঁরা বললেন আপনি যদি একটা অবজেক্টকে পরিবর্তন করেন তাহলে সেই অবজেক্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা বা পারসেপশনও বদলে যাবে। রবার্ট রোসেনবার্গ একটা ছবি আঁকলেন তার নাম বেড বা বিছানা। তিনি ক্যানভাসে পেরেক ঠুকে এটে দিলেন তাঁর নিজের বালিশ আর কম্বল (ছবি নম্বর ১০৫)।

এইটাও তাঁর মতে আর্ট যেহেতু তা দেয়ালে টাঙানো আছে।

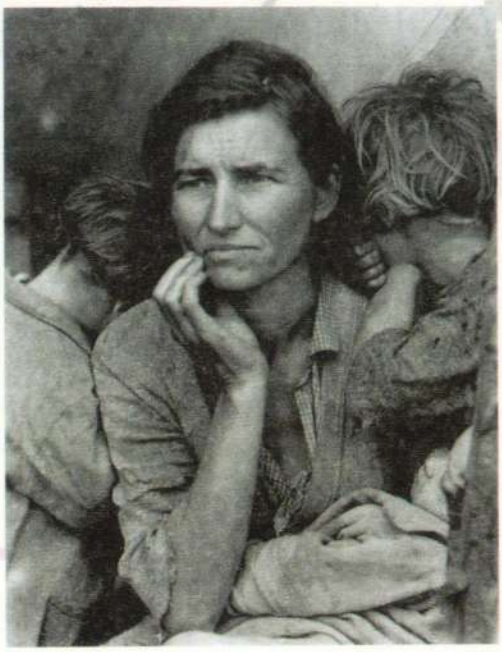

ছবি নম্বর ১০৬: মাইগ্রান্ট মাদার- ডরেথিয়া ল্যাং টে

এমনকি ফটোগ্রাফও আর্ট হিসেবে বিবেচিত হল। ডরোথিয়া ল্যাং টে ডিপ্রেশনের সময়ে এক অভিবাসী ক্যাম্পে খাবারের অভাবে থাকা এক অভিবাসী মায়ের ছবি তুলেছিলেন, সেই ক্যাম্পে কোন খাদ্য ছিলনা। সাত সন্তানের মায়ের শুন্য দৃষ্টি আমেরিকাকে কাপিয়ে দেয়। এই ছবিটা আছে আমেরিকার মিজিউয়াম অব মডার্ন আর্টে (ছবি নম্বর ১০৬)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদী পেইন্টিং

মার্থা রোজলার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে টেলিভিশনে যুদ্ধের ধ্বংসের ছবি আর তাঁর পরের মুহূর্তেই আমেরিকার আয়েশী জীবনের ছবির শার্প কন্ট্যাস্ট দেখে হাউজ বিউটিফুল সিরিজের ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নেন। এগুলোকে ছবি না বলে কোলাজ বলাই ভালো। হাউজ বিউটিফুল নামে একটা অ্যামেরিকান ম্যাগাজিন

https://nagorikpathagar.org

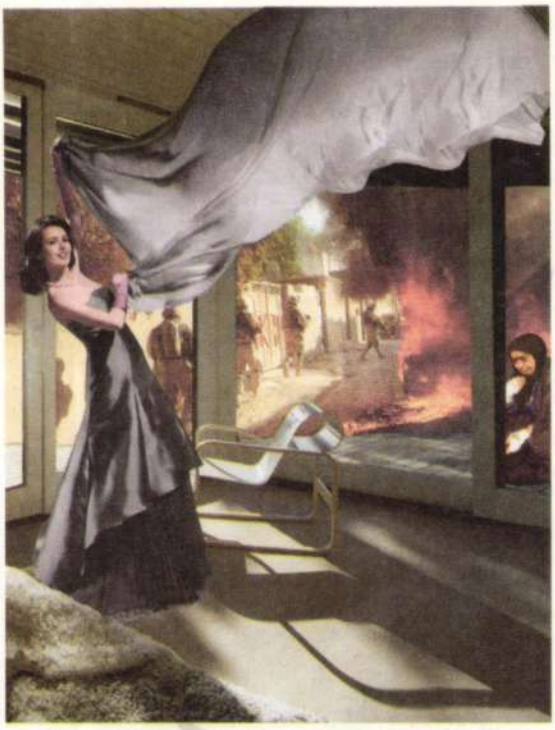

ছবি নম্বর ১০৭: ব্রিঙ্গিং ওয়ার হোম- মার্থা রোজলার

ছিল। সেই অ্যামেরিকান ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের মডেলের ছবি কেটে কেটে ক্যানভাসের সামনে বসিয়ে নিপুন দক্ষতায় তাঁর পিছনে যুদ্ধের ছবি এটে দিতেন। আমেরিকার এই আয়েশী জীবনের পিছনে ধ্বংস আর মৃত্যুর কী কী ছায়া আছে তা দেখানোর জন্য এই শার্প কোলাজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তোমার ঘরে যা আনছো তাঁর পিছনে আছে এই যুদ্ধ আর রক্তপাত। সিরিজের নামও ছিল, হাউজ

ছবি নম্বর ১০৮: ব্রিঙ্গিং ওয়ার হোম- মার্থা রোজলার

বিউটিফুলঃ ব্রিঙ্গিং ওয়ায় হোম। তোমার ঘর সাজিয়েছ সুন্দর করে কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে যুদ্ধও এনেছো সঙ্গে করেই।

ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মার্থা রোজলারের ছবির মধ্যে এরাবিক ইনস্ক্রিপশন সেই সময়েই। আর হিজাব পরা আহত রক্তাক্ত মহিলা (১০৭ ও ১০৮ নম্বর ছবি)।

মডার্ন আর্টের ক্রিটিক

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিল্পীরা এঁকেছেন। এক প্রজন্মের শিল্পীর পরে আরেক প্রজন্মের শিল্পীরা আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করেছেন। আগের প্রজন্মের শিল্পীর কাজকে আরো নিখুঁত করেছেন পরের প্রজন্মের শিল্পীরা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কিছু একটা হয়ে গেল। নিগূঢ়, উদ্দীপক আর সুন্দর প্রতিস্থাপিত হল নতুন, ভিন্নরকম আর কুৎসিত

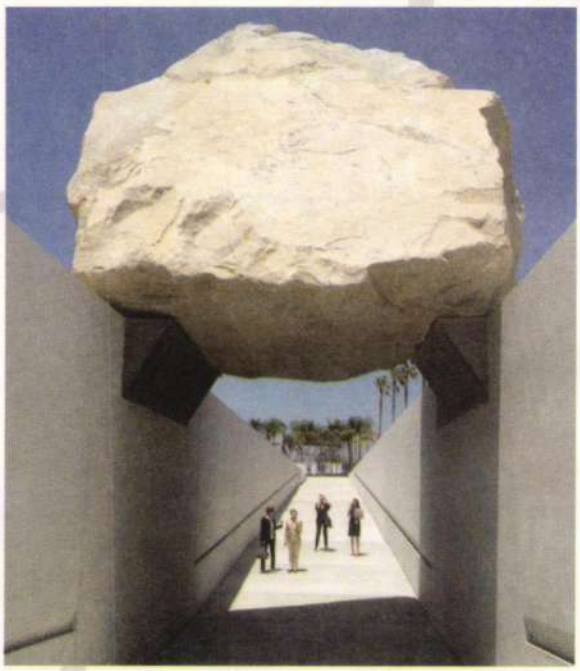

ছবি নম্বর ১০৯: মাইকেল হেইজার- লেভিটেটেড ম্যাস

https://nagorikpathagar.org

দিয়ে। আধুনিক শিল্প আসলে কোনটাকে মহৎ শিল্প বলে সেটার তত্ত্ব তালাশ করা মুশকিল হয়ে যায়। মাইকেল এঞ্জেলো পাথর কেটে শিল্প গড়েছিলেন আর এখনকার শিল্পী মাইকেল হেইজার ৩৪০ টনের পাথর এনে বসিয়ে দিয়ে তাকেই শিল্পকর্ম বলে দাবী করেন।

ছবি নম্বর ১১০: হোলি মেরি- ক্রিস ওফেলি

কয়েক শতাব্দীর শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্ব আর উৎকর্ষ কীভাবে নেই হয়ে গেল? এটা শুরু হয়েছে ইম্পেশনিজমের সাথে সাথে। আমি এটা বলছি না ইম্পেশনিজম শিল্প ছিলনা, সব ইম্পেশনিস্টদেরই প্রতিভা ছিল তাঁদের আঁকায় ডিসিপিন্ড ডিজাইন ছিল, কিন্তু পরের প্রত্যক প্রজন্মে কোয়ালিটি বা গুণগত উৎকর্ষ ক্রমাগত কমেছে। আদতে এখন আর কোন স্ট্যান্ডার্ড নাই। আপনি শিল্প বিচার করতে পারেন না, হিমশিম খান। শিল্প বলতে যা আছে তা একেবারেই পার্সোনাল এক্সপ্রেশন। শিল্পে এখন আর ইউনিভার্সাল স্টান্ডার্ড অব কোয়ালিটি নাই। এমনকি ক্রিস ওফেলি আঁকলেন হোলি মেরি ১৯৯৬ সালে ছবি ব্যবহার করলেন গরুর গোবর আর পর্নোগ্রাফিক ইমেজ (ছবি নম্বর ১১০)।

পেট্রা নামে এক পুরস্কার পাওয়া আধুনিক স্থাপত্য আছে (ছবি নম্বর ১১১)। যেখানে দেখা যাচ্ছে এক মহিলা রায়ট পুলিশ রায়ট গিয়ার পরেই মেঝেতে বসে প্রস্রাব করছে। তাঁর যোনিদেশ আর পশ্চাৎদেশ উন্মুক্ত এমনকি জিলাটিন দিয়ে মেঝেতে হলুদাভ প্রস্রাবের ইমেজ তৈরি করেছেন। যেই জুরিরা পুরষ্কারের জন্য এই শিল্পকর্ম (!) কে মনোনীত করেছিল তাঁরা বলেছে, এই স্থাপত্য প্রাইভেট আর পাবলিক স্পেইসের কন্ট্র্যাস্টটা তুলে এনেছে।

ছবি নম্বর ১১১: পেট্রা- মার্সেল ওয়ালড্রফ

কোন এস্থেটিক স্ট্যান্ডার্ড ছাড়া শিল্পের মান বিচারের কোন টুলস থাকে কি? অতীতের

https://nagorikpathagar.org

শিল্পীরাও ছবি দিয়ে মেসেজ দিয়েছেন কিন্তু শিল্পের ভিস্যুয়াল এক্সেলেন্সের সাথে কখনো কম্প্রোমাইজ করেননি। কিন্তু আজকের আর্ট গ্যালারী একটা নিরেট মুনাফা উৎপাদনকারী ব্যবসা। তারাই শিল্পের ভ্যালু বা মুল্য তৈরি করে। এটাই পুঁজির নিয়ম। তাই শিল্প বোঝার চোখ তৈরির জন্য ক্লাসিক্যাল আর্ট এপ্রিশিয়েট করতে শেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ক্লাসিক্যাল ধারার আর্ট এপ্রিশিয়েশনের এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখাও আজকের দিনের একটা বিপ্লব।

চিত্রকলার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল। যে কয়টা ছবি নিয়ে আলাপ হয়েছে তার বাইরেও অনেক বিখ্যাত পেইন্টিং আছে। চিত্রকলার আন্দোলনের আরো নানা ধারা উপধারা আছে, সবগুলো এই বইয়ের পরিসরে আলাপ করা যায়নি। তবে পেইন্টিং এর প্রধান প্রধান ধারা, চিত্রকলার নানা আন্দোলন, কালপর্ব নিয়ে সরল ভাষায় আলাপ করাই বইটির লক্ষ্য ছিল। এই আলাপে কখনো এসেছে সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, সামাজিক দ্বন্দ্ব; এই সবকিছুর মধ্যে পেইন্টিংকে বসিয়ে তার শিল্পরস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইয়ের ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তা হতেও পারেনা। কিন্তু একটা ব্যাখ্যা তো বটেই। তবে চেষ্টা করা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে যেই পেইন্টিং গুলো কালকে অতিক্রম করেছে, ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে, তার অধিকাংশ নিয়েই যেন আলাপ করা যায়। এইবার এই ছোট দুয়ার দিয়ে আপনার নিজের তৈরি জগতে প্রবেশ করুন। সেই অপরূপ জগতে আপনাকে স্বাগতম।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

তথ্যসুত্র:

১. *Understanding paintings themes in art explored and explained; Mitchell Beazley; Octopus Publishing group Ltd, 2000*

২. পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা, অশোক মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, জুলাই ১৯৮৮

৩. ছবি কাকে বলে, অশোক মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

৪. *Gardenar's Art through the Ages: The western Perspective, Fourteenth Edition, Volume II ; Fred S. Kleiner; Publisher: Clark Baxter. 2012*

৫. *Janson's History of Art; Author: H. W. Janson, Anthony Janson; Publisher: Harry Abrams 1962*

৬. *The Story of Art, by E. H. Gombrich; published in 1950 by Phaidon*

https://nagorikpathagar.org

চিত্র পরিচিতি:

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	ব্যাপ্টাইজ অফ ক্রাইস্ট-ভেরচ্চিও	১২
	ব্যাপ্টাইজ অফ ক্রাইস্ট-লিওনার্দো	১৪
	ডেভিড-মিকেলেঞ্জেলো এবং ডেভিড-বের্নিনি	১৫
	ডিস্কবোলাস - মিরন	১৬

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	ক্রুসিফিকেশন অব সেইন্ট পিটার - ক্যাভাজ্জিও	১৭
	সিস্টিন চ্যাপেল - মিকেলেঞ্জেলো	২০
	প্রাইমাভেরা - বত্তিচেল্লি	২১
	গ্রেস - র‍্যাফায়েল	২২
	রোমান গ্রেস - র‍্যাফায়েল	২৩
	দ্য লাস্ট সাপার - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি	২৭
	লিওনার্দোর নোট বইয়ে দ্য লাস্ট সাপার ছবির খসড়া স্কেচ - লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি	২৭
	সাভোনারোলা - বার্তেলেমো	২৮
	তীরবিদ্ধ সেবাস্টিয়ান - বার্তেলেমো	২৯

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	সেবাস্টিয়ান - বার্তেলেমো	২৮
	ম্যাদোনা - বার্তেলেমো	৩০
	সিস্টিন ম্যাদোনা - রাফায়েল	৩১
	নাইট ওয়াচ - রেমব্র্যান্ট	৩২
	ক্যাথিড্রাল অফ পার্মা - করেজ্জো	৩৩
	এজাম্পসন অফ ভার্জিন - করেজ্জো	৩৫
	জুপিটার এবং ইয়ো করেজ্জো	৩৪
	এম্বার্কেশন অব সাইথেরা - আতোয়ান ওয়াতো	৩৬
	দ্য ইন্টারভেনশন অব স্যাবিন উয়োম্যান - দাভিদ	৩৭

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	গ্লেনারস- মিল	৪০
	পোট্রাইট- পিয়েরে দেল ফ্রান্সেস্কো	৪০
	পোট্রাইট-হ্যান্স মেমলিং	৪০
	মোনালিসা- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি	৪১
	মোনালিসা - দুশ্যাম্প	৪২
	মাডোনা উইথ লং নেক- পারমিজিয়ানিনো	৪৪
	বাইজেন্টাইন পেইন্টিং	৪৩
	এডোরেশন অব দ্য শেফার্ড- এল গ্রেকো	৪৬
	ঔথ অব দ্য হোরাট্টি- দাভিদ	৪৮

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	ইনগ্রিসের সেলফ পোর্টেইট আর দ্বিতীয় ছবিটা দেলাক্রোয়ার নিজের	৪৯
	লিবার্টি লিডিং দ্যা পিপল - দেলাক্রোয়ার	৫০
	মিরাকল অব দ্য স্লেইভ - তিন্তোরেত্তো	৫২
	থ্রি ফিলোসফার - জর্জনে	৫৩
	ভিউ অব হারলেম উইথ ব্লিচিং গ্রাউন্ডস - রুইসডিয়েল	৫৫
	ফোর হর্স ম্যান অফ এপোক্যালিপ্স - আলব্রেক্ট ডিউরর	৫৬
	উডকাট অফ মেলাঞ্চলিয়া - আলব্রেক্ট ডিউরর	৫৮
	ফোর এপোসলস - আলব্রেক্ট ডিউরর	৫৭
	ল্যান্ডস্কেপ - কনস্টেবল	৬০

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	স্লেইভ শিপ - টার্নার	৬১
	দ্য গুড সামারটিয়ান - দ্যমিয়ে	৬৩
	দ্য গুড সামারটিয়ান - ভ্যান গগ	৬৪
	থার্ড ক্লাস ক্যারিজ - দ্যমিয়ে	৬৬
	গ্যার স্যা ল্যাজা - ক্লদ মনে	৬৯
	ক্লিফ ওয়াক এট পুহোভিল্লে - ক্লদ মনে	৬৯
	ক্লিফ - ক্লদ মনে	৭০
	লিটিল ড্যান্সার অফ ফরটিন ইয়ার্স - এদগার দেগা	৭২
	ব্যালে ক্লাস- এদগার দেগা	৭৩

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	লাঞ্চন অন দ্য বৌটিং পার্টি - রেনোয়া	৭৪
	সেজান এমিল জোলাকে পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনাচ্ছেন পল সেজান	৭৭
	প্যাস্টোরাল কন্সার্ট - জর্জনে বা তিশান	৮০
	দ্য জাজমেন্ট অব প্যারিস- রাফায়েল আর মারকান্তিও রামোন্দির যৌথ এনগ্রেভিং	৮০
	লাঞ্চন অন দ্য গ্রাস - এদুয়ার মানে	৭৯
	এক্টিও আর ডিয়ানা - তিশান	৮২
	লার্জ বেদার্স - সেজানের বেদার্স	৮১
	স্টারি নাইট - ভ্যান গগ	৮৪
	নেভারমোর - পল গগ্যা	৮৫

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	ড্যান্সার- আরি মাতিস	৮৬
	হ্যাপিনেস অব লাইফ- আরি মাতিস	৮৭
	লুকাসের দ্য গোল্ডেন এইজ - আরি মাতিস	৮৮
	ম্যান্ডোরা - জর্জ ব্র্যাক	৯০
	বটল এন্ড ফিসেশ - জর্জ ব্র্যাক	৯১
	গ্লাস গিটার এন্ড নিউজপেপার - পাবলো পিকাসো	৯২
	লেস দিমোসেলেস ডি আভিগন - পাবলো পিকাসো	৯৩
	লেস দিমোসেলেস ডি আভিগন - পাবলো পিকাসো	৯৪
	ফাউন্টেন বা ঝর্না - দুশ্যাম্প	৯৫

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	বুলস হেড - পাবলো পিকাসো	৯৬
	উইমেন ওয়ান - কুনিং	৯৭
	মেরিলিন মানরোর সিনেমার পোস্টার	৯৮
	প্রাগৈতিহাসিক ফার্টিলিটি দেবী	৯৯
	নাম্বার ওয়ান এ- জ্যাকসন পোলক	১০১
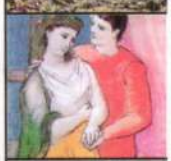	লাভার্স- পাবলো পিকাসো	১০৩
	ভিজিটেশন- পুন্টরমো	১০৪
	ভিজিটেশন- বিল ভিওলা	১০৪
	স্পুনব্রিজ এন্ড চেরি- ওল্ডেনবার্গ	১০৪

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	শি লিভড হ্যাপিলি ফর সেভেন ইয়ারস ইস দিজ ওয়ার্ল্ড- উইউই	১০৫
	সেলফ পোট্রেট উইথ ক্রপড হেয়ার-ফিদ্রা কাহলো	১০৬
	ফিদ্রা এন্ড দিয়াগো রিভেরা- ফিদ্রা কাহলো	১০৬
	রান অ্যাওয়ে- গেন লাইগন	১০৭
	মেরিলিন মনরো- ওয়ার হল	১০৭
	মেরিলিন মনরোর ফটোগ্রাফ	১০৭
	এই বাড়িটির অংশ দিয়েই বিংগোর শিল্পকর্মটি তৈরী হয়।	১০৮
	বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে।	১০৮
	বিংগো- ম্যাট্টা ক্লার্ক	১০৮

https://nagorikpathagar.org

চিত্র	ছবির নাম	পৃষ্ঠা
	বেড- রবার্ট রোসেনবার্গ	১০৯
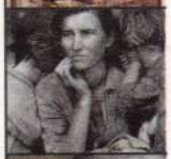	মাইগ্রান্ট মাদার- ডরেথিয়া ল্যাং টে	১০৯
	ব্রিঙ্গিং ওয়ার হোম- মার্থা রোজলার	১১০
	ব্রিঙ্গিং ওয়ার হোম- মার্থা রোজলার	১১০
	মাইকেল হেইজার- লেভিটেটেড ম্যাস	১১০
	হোলি মেরি- ক্রিস ওফেলি	১১১
	পেট্রা- মার্সেল ওয়ালড্রফ	১১১

https://nagorikpathagar.org

চিত্রকলার আন্দোলন: ১৮৭০ থেকে ১৯৩০

চিত্রকলার আন্দোলন: ১৯৪০ থেকে ১৯৮০

https://nagorikpathagar.org

কালক্রম

চতুর্দশ শতাব্দী

১৪০০ শতাব্দী — ইতালির অনেক ছোট ছোট শহর তৈরী হয় যারা অত্যাধুনিক রাজকীয় সংস্কৃতি তৈরি এবং শৈল্পিক উৎকর্ষতা প্রচারের জন্য নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে।

১৩০৪-৭৪ — লাইফ অফ পেত্রার্ক, নিকটতম মহান ইতালিয়ান মানবতাবাদী,যার কাজ চিরায়ত সাংস্কৃতিক শিক্ষার মাধ্যমে রেনেসাঁস আগমনে সহায়তা করে ।

সি.১৩০৭-২১ — Dante Alighieri লিখেছিলেন তার মহাকাব্যিক কবিতা দি ডিভাইন কমেডি।

১৩০৯-৭৭ — আভিগনন, ফ্রান্স এর পাপাল কোর্ট, অনেক শিল্পীকে আকর্ষণ করে, তাদেরকে উৎসাহিত করে ইতালির আর্টের শৈল্পিক ধারনাকে উত্তর ইউরোপে সঞ্চারণ করতে।

১৩৭৭ — ইউরোপ এবং ফ্রান্স এর মধ্যে শত বছরের যুদ্ধ শুরু হয়। যার কারণে ইংল্যান্ড এর শিল্পীদের সাথে মহাদেশীয় ইউরোপীয় শিল্পীদের যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পরে ।

১৩৪৭-৫১ — ব্লাক ডেথ নামক রোগ ইউরোপে প্রথম বারের মতো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরে যার কারনে গোটা ইউরোপ এর এক চতুর্থাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে ।

১৩৮৭-১৪০০ — চসার লেখেন ক্যান্টারবেরি টেলস।

পঞ্চদশ শতাব্দী

১৪৩৫ — ইটালিয়ান স্থাপত্যবিদ এবং শিল্প তাত্ত্বিক Leon Battista Alberti লেখেন On Painting, রেনেসাঁস এর প্রথম শৈল্পিক কীর্তি।

খ্রি. ১৪৫০ — জার্মানির গুটেনবার্গ চলমান মুদ্রাক্ষর আবিষ্কার করেন।

১৪৫৩ — কনস্টান্টিনোপল এর পতন হয় টার্কিশ অটোম্যানদের হাতে যারা অটোম্যান সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম ইউরোপ এর মধ্যে ১৫০ বছরের যুদ্ধের সূচনা করে।

১৪৬৯-১৫৩৬ — উত্তর রেনেসাঁসের মহান মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী Desiderius Erasmus এর জন্ম।

১৪৭৮-৯২ — Lorenzo de Medici, Florence এ রাজত্ব বিস্তার করেন, যিনি ছিলেন Botticelli, Leonardo da Vinci, এবং Michelangelo মতো শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক।

১৪৯২ — ক্রিস্টোফার কলম্বাস নৌপথে স্পেন থেকে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন ।

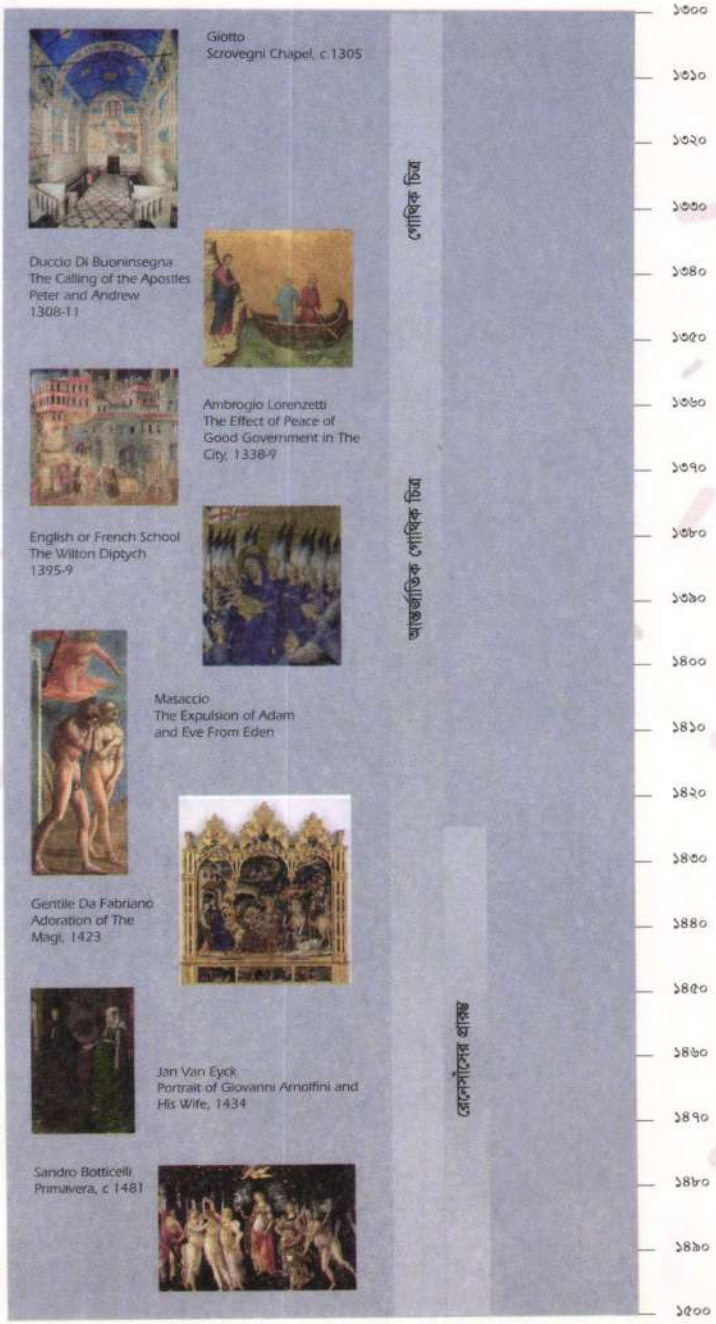

https://nagorikpathagar.org

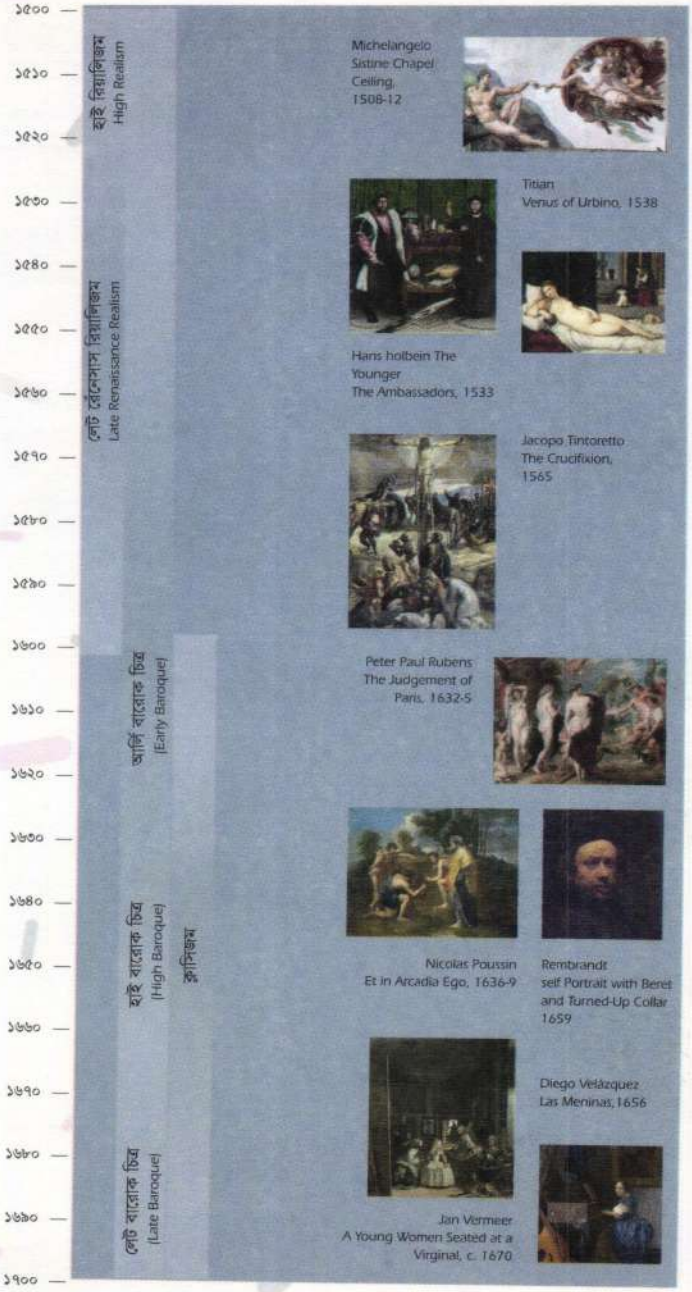

ষোড়শ শতাব্দী

১৫১৭ Martin Luther এর ৯৫ থিসিস, জার্মান প্রটেস্টান্ট রিফরমেসন এর সূচনা করে। এ সময় শিল্পীদের আঁকা অনেক ধর্মীয় ছবি ছুড়ে ফেলা হয়।

১৫১৯-২২ Ferdinand Magellan নৌপথে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেন।

১৫১৯-৫৬ পঞ্চম চার্লস এর রাজত্বকাল, যিনি ছিলেন স্পেনের রাজা এবং পবিত্র রোমের সম্রাট, টাইটানকে তার রাজসভায় নিয়োগ করার মাধ্যমে ইটালিয় শিল্পীদের ধারনাকে স্পেনে আনতে শুরু করেন।

১৫২৭ জার্মান লুথারের সৈন্যরা রোম ধ্বংস করে এবং রোমান সম্রাট এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে শিল্পে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে।

সি.১৫৩০ কাউন্টার রেফরমেশন এর সূত্রপাত। প্রটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে ক্যাথোলিক চার্চ এর আন্দোলন। এই সমসাময়িক ধারণাগুলি শিল্প ও স্থাপত্য এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে ।

১৫৩০এস Francis ও ইটালিয়ান শিল্পীদের ফতেবুতে নিয়োগ করেন। ফলে ইটালিয়ান রেনেসাঁস এর ধারণা ফ্রান্সে আসতে থাকে।

১৫১৩ Niceolo Machiavelli রচনা করেন The Prince, যা ১৫৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫৫০ Giorgio Vasari এর Lives, ইটালিতে প্রথম প্রকাশিত শিল্পের ইতিহাস ও জীবনী।

১৫৬৪-১৬১৬ শেক্সপিয়ারের এর জীবনকাল ।

সপ্তদশ শতাব্দী

সি. ১৬২০-৮০ Gian Lorenzo Bornini Baroque ঝর্ণা এবং উদ্যান দিয়ে রোমের চেহারার পাল্টে দেন।

১৬২৫-৪৯ Charles ও এর রাজ্যসভা, ইংল্যান্ডের রাজা, Peter Paul Rubens এবং Anthony Van Dyck আকর্ষণ করে, যারা ইংল্যান্ডের শিল্পকে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

১৬৪৮ ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় ভাবে Royal Academy of Painting and Sculpture প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইউরোপ ও আমেরিকার একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে।

১৬৬১-৮ ফ্রান্সের Louis XIV এর জন্য Palace of Versailles তৈরী করা হয় যা সারা ইউরোপ এর জন্য মডেল এ পরিণত হয় ।

১৬৬৭ ফ্রেঞ্চ একাডেমী নিয়মিতভাবে আনুষ্ঠানিক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে যাকে বলা হয় "স্যালন" ।

১৬৮৩ অক্সফোর্ডের Ashmolean মিউজিয়াম হচ্ছে সর্ব প্রথম মিউজিয়াম যা জনসাধারণের খুলে দেয়া হয় ।

https://nagorikpathagar.org

অষ্টাদশ শতাব্দী

১৮তম শতাব্দী হচ্ছে উত্তর ইউরোপিয়ানদের জন্য প্রদর্শনীর যুগ, বিশেষ করে ইতালিতে তাদের অর্জিত শিক্ষা সমাপনীর লক্ষে।

১৭১২-৭৮ ফরাসী দার্শনিক জ্যা জাঁক রুশো এর জন্ম। যার লেখনি রোমান্টিক চিত্রকর্ম এবং সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল ।

১৭১৩-৮৪ ফ্রেঞ্চ এনসাইক্লোপিডিয়া এর এডিটর এবং প্রথম শিল্প সমালোচক ডেনিশ দিদেরো এর জন্ম ।

১৭৪৮ প্রাচীন শহর পম্পেই আবিষ্কার, যা নিউ ক্লাসিজম এর উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

১৭৪৯-১৮৩২ জার্মান রোমান্টিক ফিলসফার, নাম্বনিক কবি এবং লেখক গোটের এর জন্ম।

১৭৫৯ লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম খুলে দেয়া হয়।

১৭৬৮ ইংল্যান্ডে রয়্যাল একাডেমী অফ আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয় যার সভাপতি হন Joshua Reynolds.

১৭৭৫-৮৩ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৭৮৯-৯৯ ফ্রেঞ্চ রেভুলশন সাময়িক ভাবে ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায় এবং নেপলিয়ান এর শাসন এর ইতি ঘটে।

১৭৯৩ প্যারিসে লুভ মিউজিয়াম জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দী

১৮২১-৬৭ ফরাসী কবি ও সাহিত্য শিল্পকর্ম সমালোচক বোদলেয়ারের জীবনকাল। যার লেখনী রোম্যান্টিক থেকে সিম্বোলিক সকলকেই প্রভাবিত করেছিলো ।

১৮৩৮ প্যারিসে প্রথম ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী করেন Louis Daguerre.

১৮৪০-১৯০২ বাস্তবধর্মী ফরাসী লেখক ও উপন্যাসিক এমিলি জোলার জীবনকাল ।

১৮৪১ লন্ডনে রঙের জন্য টুথপেষ্টের মতো ধাতব টিউব আবিষ্কার করেন আমেরিকান চিত্রশিল্পী John G Rand

১৮৬৩ প্যারিসে Salon des refuses নামে খ্যাত চিত্র প্রদর্শনী যা অফিসিয়াল একাডেমী অফ স্যালো প্রত্যাখ্যান করে।

১৮৬৭ প্যারিসে জাপানি চিত্রকর্মের প্রথম পশ্চিমা প্রদর্শনী যা ইমপ্রেশনিস্ট ও পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

১৮৭০ নিউ ইয়র্কে মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট এর উদ্বোধন করা হয় ।

১৮৭৪-৮৬ প্যারিসে ৭ জন ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র শিল্পীদের প্রদর্শনী করা হয়। নিউ ইয়র্কে ১৯৮৬ সালে প্রথম ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র শিল্পীদের প্রদর্শনী হয়।

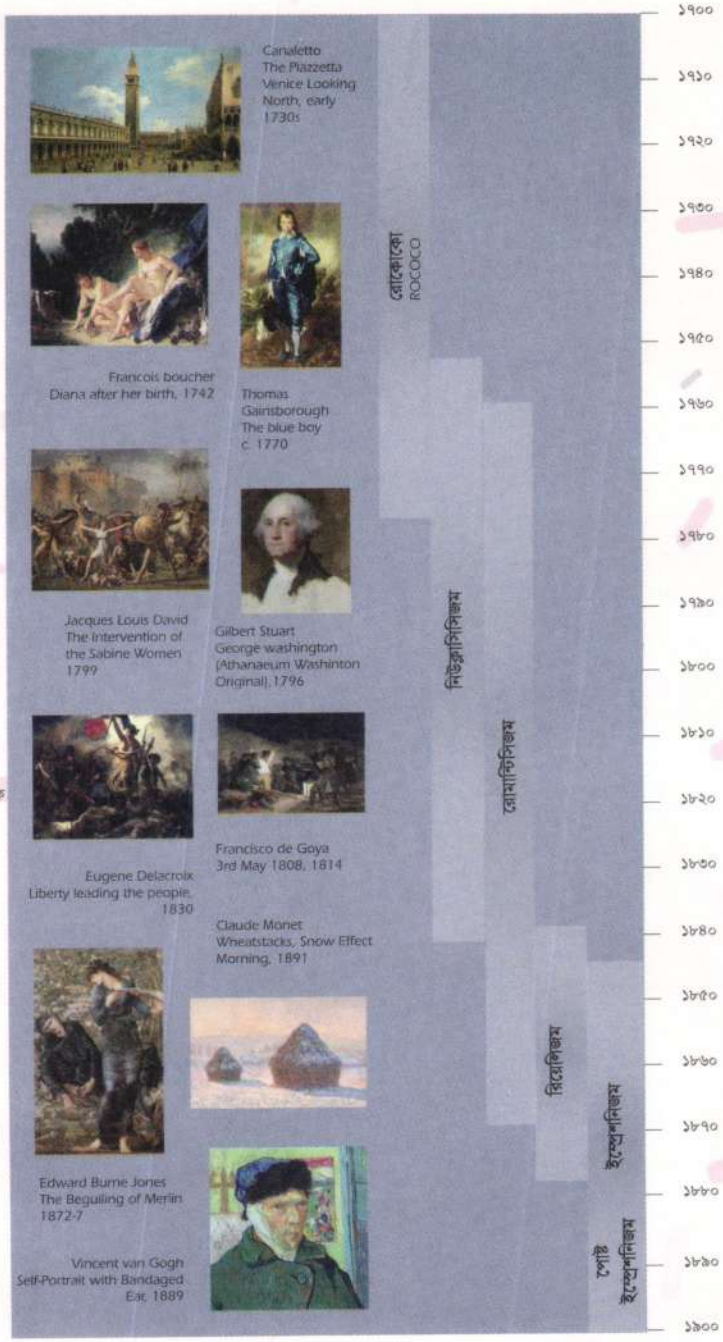

https://nagorikpathagar.org

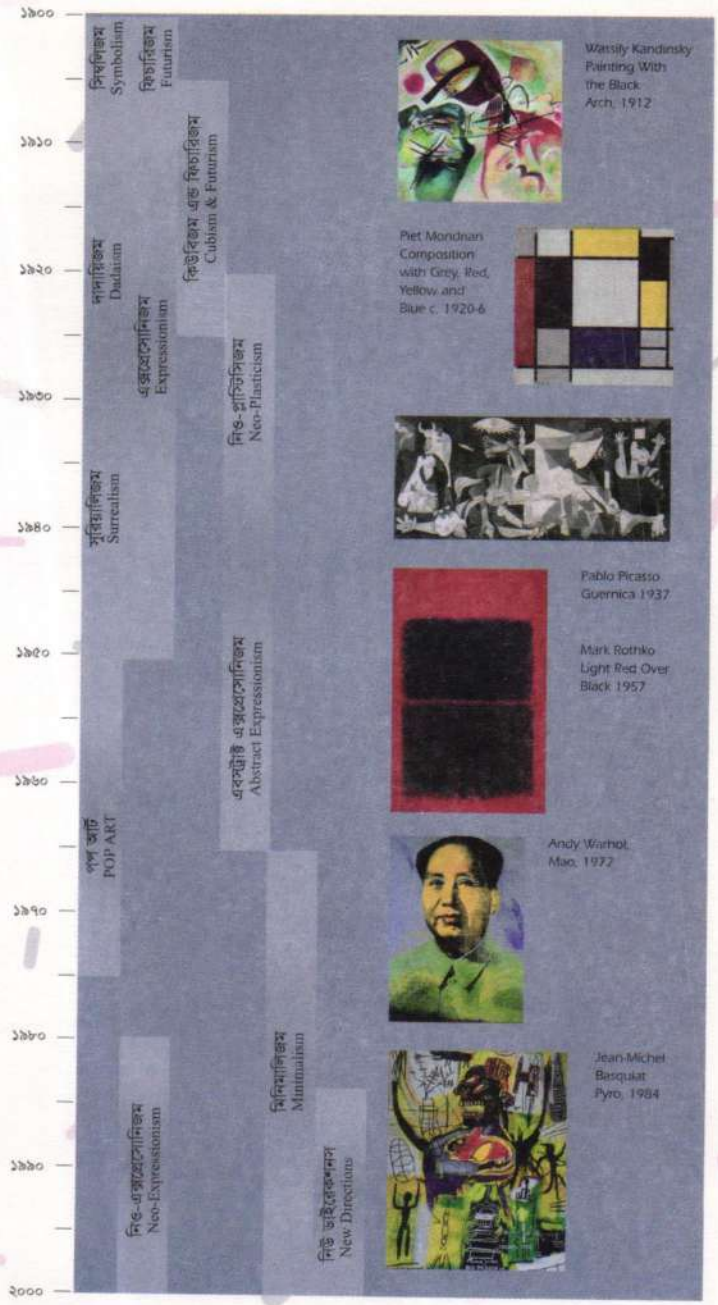

বিংশ শতাব্দী

১৯০৭	প্যারিসে প্রথম কিউবিস্ট এক্সিবিশন প্রদর্শিত হয়।
১৯১০	লন্ডনে পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট এক্সিবিশন প্রদর্শিত হয়।
১৯১০	ইটালিতে ফিউচারিস্ট পেইন্টারদের ইশতেহার প্রকাশিত হয়।
১৯১৩	নিউ ইয়র্কে ইমপ্রেশনিস্ট , পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট এবং নতুন চিত্র শিল্পীদের চিত্র উপকরণ প্রদর্শিত হয় ।
১৯১৪-১৮	প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ।
১৯১৬	জুরিখে প্রথম দাদা চিত্রকর্মের (DADAISM) বিকাশ ঘটে।
১৯১৭	রাশিয়ান বিপ্লব রাজতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে কমিউনিস্ট নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ ইলিয়ানভ লেলিনকে ক্ষমতায় বসায়।
১৯২০	রাশিয়া থেকে গবেষণামূলক সাহিত্য ও চিত্রকর্মের উপর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিধিনিষেধ এর অবসান ঘটে, Avant-garde মুভমেন্ট এর শুরু হয় এবং অনেক শিল্পী ইউরোপ ও আমেরিকাতে পারি জমায় ।
১৯২৫	প্যারিসে প্রথম সুররিয়ালিস্ট চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়।
১৯২৯	নিউ ইয়র্কে মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম প্রদর্শনীর জন্য খোলা হয় ।
১৯৩৭	মিউনিখে অ্যাডল্ফ হিটলারের "Degenerate Art" এর দর্শন করা হয়। সেখানে মডার্ন আর্ট প্রদর্শিত হয় যার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক নাজি অনুমোদিত চিত্রকর্মের থেকে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।
১৯৩৯-৪৫	দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ; মডার্ন আর্ট আন্দোলনের জন্য নিউ ইয়র্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।
১৯৫১	নিউ ইয়র্কে প্রথম দলবদ্ধভাবে abstract Expressionist ধরণের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।
১৯৬৩	নিউ ইয়র্কে এর Guggenheim মিউজিয়ামে পপ আর্ট চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়।
১৯৮০এস	ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাতে Expressionist এবং Post-Expressionist ধরণের চিত্রকর্মে জয় জয়কার শুরু হয়।
১৯৮৭	ভ্যান গগের "four Sunflowers" চিত্রকর্মের একটি ২৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলারে বিক্রি হয় যা সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক দামের রেকর্ড সৃষ্টি করে ।
১৯৯৭-৯	লন্ডন এবং আমেরিকাতে "Sensation" প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ ও মিডিয়াতে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে ।

Understanding Paintings: Themes in Art Explored and Explained; Mitchell Beazley; Octopus Publishing Group Limited, 2000 থেকে অনুদিত ও সংযোজিত।

https://nagorikpathagar.org

নির্ঘণ্ট:

আর্লি রেনেসাঁ ১২, ১৩, ২১, ৪৩
আলফ্রেড সিস্লি ৬৭
আরি মাতিস ৭৮, ৮৬, ৮৭, ৮৮
ইম্প্রেশনিজম ৬১, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৭
উইলিয়াম ডি কুনিং ৯৯
এল গ্রেকো ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫১
এনলাইটেনমেন্ট ৩৭, ৫৪, ৫৫, ৮০, ৮৩, ৮৪
এদগার দেগা ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৩
এদুয়ার মানে ৬৭, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ৭৯
এনালাইটিক কিউবিজম ৮৯, ৯১
এবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম ৯৯, ১০০
ওয়াতো ৩৬, ৩৭
ক্লদ মনে ৭
কর্নেলিস ভ্যান ডার গিস্টোর ১০, ১২
করেজ্জো ৩৩, ৩৪, ৩৫
কনস্টেবল ৫৬, ৬০, ৬১
ক্লদ মনে ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৭
কিউবিজম ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২
জর্জনে ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭৯, ৮০
জর্মন রেনেসাঁ ৫৬
জর্জ ব্র্যাক ৮৯, ৯০, ৯১
জ্যাকসন পোলক ১০০, ১০১
টার্নার ৬১, ৬২
ডিজাইন ১২
ডিউরর ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯
তিশান ৩৫, ৫১, ৮০, ৮২
তিন্তোরেত্তো ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪
দাভিদ ১৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৮, ৫০
দেলাক্রোয়ার ৪৯, ৫০, ৫১
দ্যমিয়ে ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭
দাদাইজম ৯৪, ৯৬
দুশ্যাম্প ৪২, ৪৫, ৯৪, ৯৫, ৯৬
নগ্নতা ১৪, ৭৯
প্ল্যাস্টিক উপকরন ১১
প্ল্যাস্টিক অঙ্গ ১১
পিয়েরে দেল ফ্রান্সেস্কোর ৪৩
পিকাসো ৪৫, ৪৭, ৮৩, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৩, ১০৬, ১০৯
পোস্ট ইম্প্রেশনিজম ৭৭, ৭৮, ৮৩
পল গগ্যা ৮৪, ৮৫, ৮৬

https://nagorikpathagar.org

ফ্রয়েড ৪৫, ১০০
ফৌরশর্টেনিং ১৮, ৩৩, ৩৪, ৫৩,৮৯
ফোবিজম ৮৭
বত্তিচেল্লি ১৩, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯
ব্যারোক ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৫৪
বার্তেলেমো ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩
বার্বেজ পেইন্টার ৩৯, ৪০
ব্যাকথো মহিজো ৬৭
ভ্যান গগ ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৮৩, ৮৪, ৮৫
মিকেলাঞ্জেলো ১৩, ১৯, ২০, ৩৫
মিল ৩৯, ৪০
মোনালিসা ২৪, ৪১, ৪২, ৪৫, ৯৪
ম্যাডোনা ৪৫, ১০০
মর্ডানিজম ৫৪, ৬১, ৬২
মুক্ত হাওয়ায় শিল্পী ৬৭
রেনেসাঁ ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ২১, ২৪, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৭৬, ৮১, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ১০০
রেমব্র্যান্ট ৩২, ৩৩, ৩৪
রোকোকো ৩৬, ৩৭
রোমান্টিসিজম ৫০
রেনোয়া ৬৭, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
ল্যুভ মিউজিয়ামে ২৪, ৪৫, ১০৬
লেইট ব্যারোক ৩৪
ল্যান্ডস্কেপ ১৯, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৭
লুকাস ক্রানাখ ৮৮
শিল্প বিপ্লব ৪১, ৫৬, ৬০, ৬১, ৬২, ৭৫, ৭৬
সেবাস্টিয়ান ২৮, ২৯, ৩২
সিস্টিন চ্যাপেল ২০
সেজান ৪৫, ৪৭, ৭১, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৯
সিনথেটিক কিউবিজম ৮৯, ৯৯
হ্যান্স মেমলিং ৪০, ৪৩
মর্ডান আর্ট ১০৩, ১০৫, ১০৮
এস্থেটিক স্ট্যান্ডাড ১১১
মাইকেল হেইজার ১১১
পেট্রা ১১১
পুঁজি ১১২
মার্থা রোজলার ১১০, ১০৯
ডরেথিয়া ল্যাং টে ১০৯
স্পেইস ১৮, ৩৩, ৪৩, ৮৩, ৮৯, ৯৪, ১০০, ১০৮, ১১২
ম্যাট্রা ক্লার্ক ১০৮
ওয়ার হল ১০৭
ফিদ্রা কাহলো ১০৫, ১০৬
গেন লাইগন ১০৬, ১০৭

https://nagorikpathagar.org

যারা শিল্পকলার ছাত্র নন, প্রথাগত শিল্পবোদ্ধা নন, তাঁদের জন্য পেইন্টিং নিয়ে এই বই। পেইন্টিঙের প্রধান প্রধান ধারা, চিত্রকলার নানা আন্দোলন, কাল, পর্ব নিয়ে সরল ভাষায় মনোহর ভঙ্গিতে আলাপ করা হয়েছে বইটিতে।

Mon Bhramarer Kajal Pakhay
(A book for beginner's in western painting appreciation)
by Pinaki Bhattacharya

Cover Design: Silentext guided by 'The Gallery of Cornelis van der Geest'

Price: 400.00 only
facebook.com/baatigharpub

A Baatighar Publication

9 789848 825990

https://nagorikpathagar.org